জধা হিজেক

বিঝু-২০১৭

সম্পাদনায়
নির্মল কান্তি চাক্‌মা

সহ-সম্পাদক
জয়েস চাক্‌মা

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি

(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন)

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

জধা

প্রকাশকাল

বিঝু- ১৩ এপ্রিল-২০১৭খ্রিঃ

সম্পাদক

নির্মল কান্তি চাক্‌মা

সহ-সম্পাদক

জয়েস চাকমা

সম্পাদনা সহযোগীতায়

শান্তি চাক্‌মা, অনুদেব চক্‌মা, নোবেল চাক্‌মা তমেশ, অনেজ কান্তি চাক্‌মা, প্রশস্তি চাকমা, উত্তম চাক্‌মা, অবিনাশ চাক্‌মা, ধীরা তালুকদার ও রতন মণি চাকমা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

লিটন চাকমা অন্নদা ও বিপ্লব চাকমা

প্রচ্ছদ

নির্মল কান্তি চাক্‌মা

বর্ণ বিন্যাস

বিশ্বময় চাকমা ও পহ্‌র চাকমা

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

ছড়াথুম পাবলিশার্স, রাঙ্গামাটি ।

শুভেচ্ছা মূল্য

২০০ টাকা

যোগাযোগ
বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ই মেইল: bkkksrj@yahoo.com
www.banajogichara.org

Contact Adress:
Banajogichara Kishor Kishori Kalyan Samity
Banajogichara, Jurachari
Rangamati Hill District
e-mail: bkkksrj@yahoo.com
www.banajogichara.org

----------সম্পাদকীয়

বিঝু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের একটি পরিচিত নাম। সমতলেও কিছু কিছু সাহিত্য প্রেমী ব্যক্তির কাছে যথেষ্ট নাম ডাক রয়েছে। এটি এ জনপদের একটি প্রধান উৎসব, যে উৎসবটি যথাযোগ্য মর্যাদায় ও আওম্বরপূর্ণভাবে এখানকার বসবাসরত আদিবাসীরা পালন করে চলেছে। বিঝু এ জনপদের ঐক্যের প্রতীক। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও পুরো দেশজুড়ে বিঝু উৎসবের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমরা প্রত্যাশা। বিঝু উৎসবকে জানুক সকলে।

"জধা হিজেক" একটি চাকমা শব্দ। যার বঙ্গার্থ ***'একসাথে আওয়াজ'***। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে পশ্চাৎপদ, নিপীড়িত-নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের জন্যে একসাথে আওয়াজ তুলতে চায়। পরিবর্তন চায়, মুক্তি চাই সকল শৃঙ্খল থেকে। সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জধা হিজেক দিয় আমরা।

সংকলনে প্রকাশিত, লেখাগুলোর বক্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব। লেখার ব্যাপারে সম্পাদনা পরিষদ কোনভাবে দায়ী নয়। সংকলনে প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দিয়েছি। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আশা করি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বিঝু নিয়ে আসুক অনাবিল সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। সবাইকে জানাই বিঝুর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

----------সূচী----------

প্রবন্ধ

গৌতম লাল চাকমা/ বিঝু উৎসব পুনমিলনের দিন -৬, ধর্মকীর্তি চাকমা/ বার্গীর চোখে জুরাছড়ির বনযোগীছড়া-১২, শুভ্র জ্যোতি চাকমা / চাকমা বিংশ শতাব্দী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি সাহিত্য চর্চার নবজাগরণ-১৬, শ্রী প্রগতি খীসা /প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান-৪০, জির কুং সাহু/বম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান জীবিকা পদ্ধতি-৪৮, হাফিজ রশিদ খান/বিঝু-বৈসুক-সাংগ্রাই-বিহু... প্রাণে প্রাণ মেলানোর উৎসব - ৫২,ধীরকুমার চাকমা/মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিড়্গা- ৫৬, আনন্দমিত্র চাকমা/প্রেক্ষিত:সমকালীন চিন্ত্মা- ৬৫, মনোজ বাহাদুর/মঞ্চ নাটকের ডিজিটাল ধারণা- ৬৮, অজিত কুমার তন্চংগ্যা/তুচ্ছ বর্ণভেদ-৭৩

কবিত্যেয় ন' কয়্যা কধা

মুকুন্দ চাকমা / ন' কয়্যা কধা- ৭৫

চাকমা ছড়া

শ্যামল তালুকদার/একজুর ছড়া-৮৪

চাকমা কবিতা

শিশির চাকমা/তিরোচ্চে স্ববনানি কানি যায়-৮৫, বীর চাকমা / জুঙোল তানানা-৮৬, জগৎ জ্যোতি চাঙমা/বাচ্যে থানার অক্তগুন-৮৭, সুমীরণ চাঙমা/কাবাক ঝাবাক-৮৮, তঞ্চঙ্গ্যা ইতি চাকমা /কগিলর র' শুনঙর-৯৮, পহ্র চাঙমা / চিগুদ চাগাদ-৯০, হৃদয় চাকমা /কোচপেয়ে মনান -৯০, জেভিয়াস চাকমা / লারেই-৯১,ভদ্র সেন চাকমা/দশ'ই নভেম্বর'-৯২, কে ভি দেবাশীষ চাকমা / মেঘ-৯৩,সুনাম দেওয়ান / বিঝু- ৯৪, কিকো দেওয়ান / বিঝু তুই এলে-৯৫, চুংকু চাকমা/চিজি-৯৬,ইন্দ্রদত্ত তালুকদার / ও বিঝু-৯৭, নির্মল কান্তি চাকমা/ধুলি- ৯৯,উদয় শংকর চাঙমা/ ম' মনান গম নেই-১০০, শিখা চাঙমা / থরে থরে -১০১, মৃত্তিকা চাকমা - ১০২

তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা

কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা/নেতা-১০৩

ত্রিপুরা কবিতা

Mukul Kanti Tripura / Talpilani Horo-105

বাংলা কবিতা

জড়িতা চাকমা/ আজি এ বসন্তেত্ম- ১০৭, নিও হ্যাপী চাকমা / আমি নারীবাদী নই অধিকারবাদী-১০৮, অনন্ত্ম যাত্রা/উ উইন মং জলি-১০৯, মানসুর মুজাম্মিলে / দু'টি কবিতা-১১০,সুপ্রকাশ চাকমা / ভাললাগা বিঝু- ১১১, লালন কান্তি চাকমা / স্মৃতিতে বান্দরবান-১১২,অনুকনা চাকমা / জীবন তো এটাই-১১৩, কবিতা চাকমা / কল্পনা চাকমা-১১৪, হ্লাপ্রন্নসাইন মারমা (সাইন)/চেতনা উদ্দীপন- ১১৭, হারাধন বৈরাগী/ডুঙ্গুর- ১১৮, সাগরিকা চাকমা / ব্যার্থতা-১১৯, রবি শংকর চাকমা/জাতীয় পরিচয়-১২০, রন্নপেন্দু বিকাশ চাকমা/স্বর্গীয় কবি চিত্র মোহন-১২১, অরন্নমিতা চাকমা / ভেঙ্গে অংশিত জীবন ১২২, মনো রঞ্জন চাকমা/পরীক্ষার হল-১২৩, সুশীল বিকাশ চাকমা/ মিনতি-১২৩

চাঙমা গীদ

পঠন চাকমা/মোন মুরো তারন্নম বন-১২৪, রীএলি চাকমা সুজল/ এলং, আঘী, থেবং-১২৫ অনুকনা চাকমা / পাততুরন্নতুরন্ন বেক্কুনরে- ১২৫, কিশলয় চাকমা / চেরবো দেজর গীদ-১২৬, তরন্নন আলো চাকমা /যদি পিথিমীত-১২৮, স্মৃতি জীবন তালুকদার/বিদেয়র গীত-১২৯

ছোটগল্প

বিপম চাকমা /পিনোন-হাদি-১৩০, ভিএন চাঙমা /ধূজো- ১৩৪, লাভলী বাশার / বাকরন্নদ্ধ-১৪২, লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা /রহস্যটি আসলে কী?- ১৪৮, রবিশ চাকমা/ব্যর্থ জীবন-১৫১

গৌতম লাল চাঙমা

বিঝু উৎসব পুনমিলনের দিন

বিঝু চাকমা জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সেই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। সমাজ চিন্ত্মার সাথে ও তপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি। মানুষের ঐতিহ্য টিকে আছে সংস্কৃতির উপর। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সমাজের ধারক ও বাহক।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির বিভিন্ন উৎসব পার্বন পালন করেন। চাকমা জনজাতিরা পালন করেন বিঝু উৎসব। প্রাচীণ কালে পক্ষকালব্যাপী বিঝু উৎসব পালন করা হতো। সেই পথকালের মধ্যে কেউ মারা গেলে স্বর্গবাসী অবশ্যম্ভাবী বলে চাকমারা বিশ্বাস করেন। সেদিক আজ অতীত দিন কাল বদলে গেছে। বদলে গেছে মানুষের ধ্যান ধারণা জীবনযাত্রা। বর্তমানে মৈত্রের শেষ দুই দিন ও ১লা বৈশাখ এই তিনদিন বিঝু উৎসব পালন করা হয়।

চাকমাদের বিঝু উৎসবের সাথে বাঙালিদের চৈত্র সংক্রান্তি একই সময়ে পালন করা হয়। ওই একই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে বিঝু উৎসবের প্রায় অনুরূপ উৎসব পালিত হতে দেখা যায়। যেমন, ভারতবর্ষের আসামে চৈত্র মাসের শেষে মহা সমারোহে বিহু উৎসব পালিত হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনজাতিদের মধ্যে চৈত্রের শেষে দুই দিনে বৈইসু বা বিষু উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই ওই দিন থেকে কবরক জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ঝাড়খন্ড এলাকার আদিবাসীরাও বলতে গেলে ওই একই সময়ে বিহু পরব উদযাপন করে থাকেন। মায়ানমারের আরাকানে মগ জনজাতিরা এবং বাংলাদেশের মারমা আদিবাসীরা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে।

বিঝু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা নিয়ে নানা মত আছে। তবে এই বিঝু উৎসব চাকমা জনজাতিদের জাতীয় উৎসবে পরিগণিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর যে দেশেই চাকমা আদিবাসীরা রয়েছেন, সেখানে বিঝু উৎসব পালন করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য মায়ানমার, ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, অরন্নণাঞ্চল ও প্রদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায়

উদযাপিত হয়। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, ক্যালোফোর্নিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী চাকমা জনজাতিরা বিঝু উৎসব পালন কররে থাকেন।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির পরিচয় বহন করে চলেছে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা সকল জাতিগোষ্ঠির লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যের অহংকার এই উৎসব চাকমা জনজাতিদের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে। এই উৎসবে একদিকে যেমন সকল গস্নানি, ব্যথা ভুলে আনন্দ, উৎসব ও উচ্ছাসের।

বিঝু উৎসবের সাথে জুম চাষের একটা নিবির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে জুম (জঙ্গল কাটা) ফাল্গুন চৈত্র মাসে জুম পোড়ানো এবং বৈশাখ এই মাসে বৃষ্টির সাথে সাথেই বীজ বপন করা হয়। তাইতো উভোগীত (লোকসঙ্গীত) শিল্পীরা গেয়ে থাকেন।
ফাল্গুন আহবা নে ফিরিল
বজর শেচ কাজেল

অর্থ্যাৎ ফাগুনের হাওয়া এসেছে ফিরিয়া এবং বৎসরের শেষ প্রান্তেত্ম এসে গেছে। উভোগীত আরও গেয়েছেন
ছড়া আগারে আগারে গুদুঙমাছ
গুজুরি পরেত্তি বৈজেক মাস
বৈজেক মাঝ ধান কজা
উত্তর ধাগন্দি পান কদা'।

অর্থ্যাৎ ছড়ার জল শুকিয়ে গেছে তাই গুটুঙ মাছেরা ছড়ার উজানে যেখানে একটু একটু জল আছে সেখানে আছে বৈশাখ মাসের মেঘ গর্জনের বৃষ্টিতে সিক্ত ভূমিতে বীজ বপনের সময় এসে যাবে এবং উত্তর দিকে পান বাগান থাকার কথা উলেস্নখ্য করা হয়েছে।

আদিম কালে যাযাবরের জীবনযাত্রা থেকেই বিদ্যার সূচনা হয়েছিল যা আদিবাসীরা বর্তমানেও এই পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে আসছেন সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ আদিম এ আদিম চাষ পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে থাকে চাক্মা জনজাতিরা বলেন জুম ককবরক ভাষীরা বলেন জুম আসামীরা বলেন 'হুক' আসামীরা বলেন 'পডু' এছাড়া ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে অন্দ্রপদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে এই পদ্ধাতিতে চাষ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন নামে। বহি ভারতে আমাজান অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া এই আদিম কৃষি কাজ পদ্ধতিতে চাষ করেন এছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম চীন দেশে কর্তন ও দহন চাষ বলে থাকেন।

বৈজ্ঞানিক ও বাস্ত্মববাদী দর্শন শাস্ত্রবাদের মতে অবৈদিক ধারায় প্রকৃতি বা নারী চেতনা থেকেই কৃষি বিদ্যার উদ্ভব। যেখানে আদিম কালে জাদু বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্র স্ত্রোক স্ত্রোক বা গানের বা গানের মাধ্যমে শস্য বীজ বপন বাগান করে প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করা হতো ফসল লাভের জন্য মাটি থেকে চারাগাছ জন্মানোর রহস্য মহিলারাই আবিষ্কার করেছিলেন। কারণ মহিলারাই বেশী আবেগ প্রবন । তারা প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যকে তাঁদের মত করে রূপ দিয়েছেন। তাই নারীকে ড্রোত্র বাদিতে তারা ভূমিকে মাতৃরূপে মনে করেন। তাই নারিকে ভূমি রূপেই বর্ণণা করেছেন। মাতৃরূপী পৃথিবীকে করে শস্য উৎপাদন করার পদ্ধতি বের করেছিলেন।

হয়তো বা এ কারনেই বিঝুদিনে চাকমা মেয়েদের খাদি(বক্ষবন্ধণী) পরিধানের একটা আনুষ্ঠানিকতা ছিল প্রচলিত রীতি। কিশোরী থেকে যৌবনের প্রারম্ভে মেয়েদের বিঝু দিনেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বুকে খাদি পরিধান করে থাকেন। তবে বয়স হিসাব করে যে বছর জোড়া বছর হবে সে বছরেই খাদি পরিধান রীতি। এমনকি খাদি পরিধানের আগ পর্যন্ত্ম বিবাহ প্রস্ত্মাব দেওয়া চাকমা আদিবাসী সমাজে নিষিদ্ধ।

সে যাই হোক, বিঝুর মৌলিক বৈশিষ্টগুলো এখানে আলোচনা করা হল।

তিনদিন ব্যাপী বিঝু, উৎসবের প্রথম দিনটিকে ফুল বিঝু দ্বিতীয় দিনটিকে মূলবিঝু এবং তৃতীয় দিনটিকে অর্থ্যা ১লা বৈশাখকে গর্যাপর্যা বলা হয়। এর মধ্যে মূল দিনটিই মুখ্য। এটি সবচেয়ে পবিত্রতম দিন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফুল বিঝু দিনে প্রত্যুষে পাতার উপর ফুল রেখে নদীতে ভাসানো হয়। গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়ে যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে বিভিন্ন প্রকার বুনোফুল এবং বিভিন্ন সব্জী সংগ্রহ করে। বড় বড় গাছের ডালে বড় বড় লতা দিয়ে দোলনা টাঙিয়ে উভোগীত (লোকসঙ্গীত) এর মাধ্যমে প্রিয় জনকে দোলানো হয়। চাকমাদের প্রাচীন লোক সাহিত্য রাধামন ধনপুদি পালা (ব্যালত)য় নায়ক রাধামন ও ধনপুদির বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে ফুলবিঝু দিনে পুবঙতুলি দি'মুরো পাহাড়ে গিয়ে নাগেগশ্বর ফুল সংগ্রহ করার বিষয় অবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়।

সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে, বাড়ির চারপাশে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়। ফুলবিঝু দিন রাতেই প্রতি ঘরে ঘরে পিঠাপুলি তৈরীর ধুম চলে। মূলবিঝু দিনে অতিথি অভ্যাগতদের আগমনের জন্য বিনি পিঠা, সান্যে পিঠা, কলা পিঠা, --- বরা পিঠা ইত্যাদির সম্ভার।

মূল বিঝু, কাকভোরে তোপধ্বনির মাধ্যমে বিঝুর আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। শুচি স্নান করে প্রত্যেক ঘরের ছেলেমেয়েরা ধান-চাল নিয়ে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির উঠানে গৃহপালিত পাখীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অর্থ্যাৎ বিঝুদিনে প্রাণী ও পাখীরাও অবাধে বিচরনের অধিকারী।

বিঝুদিনে দলবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিঝু নৃত্য সহকারে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিঝু পরিক্রমা করা হয়। প্রত্যেক বাড়িতে খাবার দেওয়া হয়। খাবারের মধ্যে পিঠা, মদ, জগরা, পাচন তরকারী ইত্যাদি। চাক্‌মা সমাজে কথিত আছে, কমপক্ষে সাত বাড়ির পাচন তরকারী খেলে রোগ ভাল হয়। বিঝুর দিনে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে যায়। এর আসল উদ্দিশ্য পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে সামাজিক মিলন ঘটে। ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং আন্ত্মরিকতা বৃদ্ধি পায়। এই দিনে বয়জৈষ্ঠ্যদের প্রণাম ও আর্শিবাদ গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত।

দুপুরে ঘিলে খেলা, জ্যোৎস্না রাতে গুদু খেলা, পোহর খেলা প্রভৃতি সংগঠিত হয়ে থাকে। বয়াকর নিজস্ব ধর্মীয় শাস্ত্র আগর 'তারা গ্রন্থ মেকে দাসপারমি' ও সাহস ফুল তারা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠান পাড়া থেকে দূরবর্তী জঙ্গলে মধ্যে হয়ে থাকে। বিঝুর দিন গুলোতে লোকসংস্কৃতির দিকটিও উলেস্নখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আগেরকার দিনে রাতে গেংখুলি (চারণ কবি) দের পালা গানের আসর বসে। এতে' রাধামন ধনপুতি পালা' লরবো মিডুঙি পালাসহ অন্যান্য পালা সারা রাত ব্যাপী পরিবেশিত হয়।

গটাপঠা: আগের দিনের উদ্দাস নৃত্য, খেলাধুলা, খাওয়া দাওয়া ক্লান্ত্ম ছেলে-মেয়েরা বিছানা থেকে উঠতেই চায় না। বিছানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে। গর্যাপর্যা দিন মানে গড়াগড়ির দিন। ওই দিন সারা বছরের সুখ শান্তি্ম ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রত্যেক বাড়িতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়। বুরপারা, চুমুলাঙ, অইয়া পূজা, মঙ্গল সূত্র পাঠ ও শ্রবণ করা হয়। এই সময়ে বাড়ির প্রত্যেক সদস্যকে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয়। তাই এই দিনদিকে পুনর্মিলনের দিনও বলা হয়।

চাকমা জনজাতিদের বিঝু উৎসবে ধর্মীয়, সামাজিক, লোকসংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য ও ক্রীড়ায় উজ্জল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রচীনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাজ্যের অন্তর্গত রাঙ্গুনিয়ার কদলপুর বা পদলপুর বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গনে চাকমা রাণী কালিন্দির উদ্যোগে মহাসমারোহে বিঝু উৎসবের আয়োজন করা হতো। উৎসবে যুবক-যুবতীদের উদ্দাস নৃত্য, প্রবীণদের সুখে আজও শোনা যায় সেই সব পুরনো দিনের কথা। সেই উৎসব থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে কদলপুর বা পদলপুর নৃত্যের সৃষ্টি হয়। যা ভারতে বিঝু নৃত্য হিসাবে পরিচিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিকে পুনরূজ্জীবিত করে তার প্রচার ও প্রসারে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা উলেস্নখ করা যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসব রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় পালিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজা ভিত্তিক বিঝু উৎসব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হচ্ছে। এছাড়া চাক্‌মা জনজাতিদের বিঝু উৎসব ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক কেলেন্ত্মারে অন্তর্ত্মভূক্ত
করা হয়েছে। যা অতি গৌরবের।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালে অধিভুক্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার মাছমারা গ্রামে প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে বিঝু উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে চাকমা জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গেংখুলী (চারন কবি) পালা গানের আসর ও লোকক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের সবাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন বিদ্যাসাগর চাকমা, পদ্মধর চাকমা, সম্পাদকে ও সহকর্মী দক দয়াল বিকাশ চাক্‌মা, তটিনি চাকমা, কোষধক্ষ্য গৌতম লাল চাক্‌মা ও সদস্য লুসাই চন্দ্র চাকমা। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন মোহিণী মোহন চাকমা, অনন্ত্ম মোহন চাকমা সহ অনেকে। সহযোগিতায় ছিলেন বিমল মসেন চাকমা, সুকুকার চাক্‌মা সহ ওই সময়ের একঝাক যুবক। উদ্যোক্তা কিমিটির নাম করন করা হয়েছিল চাকমা গাবুচ্যা জধা পরিষদ। এরপর থেকে প্রতি বছর মাছমারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিঝু উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

১৯৮২ সালে মাছমারা, তারকাদেবী সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গনে আয়োজিত বিঝু উৎসবে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলে, বিঝু উৎসবে উপস্থিত হন। তিনি এই উৎসবের গুরন্নত্ব উপলব্ধি করে বিঝু উৎসবকে রাজ্য ভিত্তিক বিঝু উৎসব অনুষ্ঠিত করার ঘোষনা দেন। ১৯৮২ সাল থেকে মূলবিঝু দিনটিকে বিঝু উৎসব উপলক্ষে সরকারী ছুটি হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বিঝু উৎসব উদযাপন চাকমা অধ্যুষিত ব্লক গুলোতে পর পর দুই বছর আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

১৯৮৫ সালে পেচারতল হাই স্কুল মাঠে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহাসমারোহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম রাজ্য ভিত্তিক বিঝু মেলা ও উৎসব উদযাপিত হয়। সেই থেকে চলে আসা রাজ্য ভিত্তিক বিঝু উৎসব প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে চাকমা অধ্যুষিত এলাকায়।

বর্তমানে বিঝু উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন বিঝু অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ফলে ওই উৎসবের মধ্যদিয়ে জাতি জনজাতির মেল বন্ধনের একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠে পাশাপাশি জাতি-জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতির

ঐতিহ্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও গুরম্নত্ব প্রদানের মধ্যদিয়ে জাতি-জনজাতির দীর্ঘ দিনের মৈত্রী বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

.....

গৌতম লাল চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক, ত্রিপুরা ,ভারত

ধর্মকীর্তি চাকমা

বার্গীর চোখে জুরাছড়ির বনযোগীছড়া

অগ্রগামী কবি মৃত্তিকাদা আমাকে যেভাবে একটা লেখা দিতে বললেন মনে হয়েছিল জুরাছড়ির বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতিতে তাঁর একটা দরদ পড়ে আছে। জুরাছড়ির বনযোগীছড়াতে ওরা সংস্কৃতি চর্চা করছে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। মৃত্তিকা দা স্বয়ং একজন কলম সৈনিক সুতরাং তাঁর কাছ হতে ঐ রকম দরদী এবং অভিভাবক সুলভ কণ্ঠস্বর বেরোবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কথাটা শুনে আমি নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবতে থাকি। অবশেষে ভাগ্যকে দুষে নিস্তার পেতে চেষ্টা করি। কেননা সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোতে জুরাছড়ির যে ঋণ তা আজও আমরা শোধ করতে পারিনী।

জুরাছড়ি দু'এক ঘন্টার জন্য যাওয়া হয়েছিল। এত অল্প সময়ে আমার করার কিছুই ছিলনা। একমাত্র জুরাছড়ি নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। ধান্য জমিগুলো জলে টই টম্বুর। একটা বিস্তীর্ণ জায়গায় জলাশয়ে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছিল। চতুর্দিকে গাছগাছালির ক্যানভাসের ফাঁকে ফাঁকে ঘরগুলি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কান্ট্রিবোট এক ঘাটের মত স্থানে থেমে গেল। মনে হয়েছিল পথের দূরত্ব শেষ। সময় বেশী লাগে নাই- বুঝলাম চেক পোষ্ট। বনযোগীছড়া সেনাছাউনী দেখে তাঁদের ছবিগুলো মনে পড়ে গেল। জলপাই রঙের উর্দ্দী ,হাতে অস্ত্র পেছনে রোকচেক যারা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছিল শান্তিবাহিনী গেরিলা যোদ্ধা নামে, আজ তারা নেই আর্মি ক্যাম্প সদর্পে আছে।

বনযোগীছড়া জুরাছড়ি উপজেলার বহুল উচ্চারিত এক জনপদ। বনযোগী শব্দটার মধ্যে কি একটা ভাবের উদয় হয় মনে। নিবীড় বন/জঙ্গল ব্যতীত যখন কিছুই ছিলনা সে সময় এই বনে থাকত সাধনায়রত যোগীগণ। যাক ইহা আমার কল্পনামাত্র। সেই বনযোগীছড়াস্থ কিশোর

কিশোরীর কল্যান সমিতির উদ্দেশ্যে কলম ধরেছি বটে। কিশোর কিশোরীর সন্ধিক্ষনটা আমরা বয়সীরা পেরিয়ে এসেছি। অফুরন্ত দুরন্তপনা গতি আর প্রানোচ্ছলতার মাধ্যমে দারম্নন এক জীবনের অধ্যায় এটি। তুলনা করা যায় একজন ড্রাইভার আর পাইলটের সহিত। সামান্য ভুল করার সময় নয় এটি। সামান্য ভুল করার অর্থ এক্সিডেন্ট। এক্সিডেন্ট এর ফল, সকল সম্ভাবনার ভরাডুবি। স্বপ্ন সমূহের মরে যাওয়া বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী হওয়া। পরিণত বয়সে সাফল্য অথবা ব্যর্থতার আক্ষেপ এ সময়ের নিধারিত হয় বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরীদের অকৃত্রিম অভিনন্দন তারা একতাবদ্ধ হয়েছে একটা অভিষ্ঠ লক্ষ্য তাদের-কল্যাণ সাধন। সর্বকল্যান সমৃদ্ধ বনযোগীছড়া জুরাছড়িকে অনেক অনেক সমৃদ্ধ করবে। সমৃদ্ধ জুরাছড়ি উপজেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাকে সমৃদ্ধ করবে।

একই ভাবে সমৃদ্ধ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেল। সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের হাতছানি। আর তিন পার্বত্য জেলার সুখ-শান্তিত্ম অগ্রগতি স্থিতিশীলতাই মধ্যম আয়ের সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উন্নত সমুন্নত মর্যাদাশীল বাংলাদেশের ভিত্তি। আর এরকম অবস্থাতেই আমাদের উপযুক্ত উত্তরসুরীদের জন্ম ঘটবে। বহুল উচ্চারিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্থান পতনের ইতিহাসে জুরাছড়ি এক অনন্য নাম। সেই সুবাদে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি জুম্মজাতির জাতীয় জীবনে আর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের দিন গুলোতে এক অনন্য ----- অবদান রেখেছে। আমি দূর হতে জুরাছড়িকে সমীহ করি।

জুম্মজাতির সবচেয়ে ট্রাজেডির দিনগুলিতে জুরাছড়িগণ সর্বস্বহারা হতে বাধ্য হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী সু-লেখক ও বনযোগীছড়ার সুযোগ্য সন্তান প্রিয় কুমার চাকমা যখন বলেন," সমৃদ্ধশালী জুরাছড়ি এলাকা কাপ্তাই বাঁধের জলে টলিয়ে যাবে। বিরাট বিরাট শতবর্ষী গাছ কাটা হচ্ছে । দেশ ছেড়ে যাবার দল প্রস্তুতি নিলো, যাবে, যে বলা সে কাজ, বিদায়ের পালা। পুরো পাড়া, পুরো জুরাছড়ি এলাকা যেদিকে কর্নগোচর হয় সেদিক থেকেই কান্নার বাঁধ ভাঙা জোয়ার, আর্তচিৎকারের কণ্ঠ, কেউ বাঁধা দেয় যেতে কেউবা চায় সাথে নিতে যাবার দল ঘর থেকে বেরোয় আবার ঘরে ঢোকে, প্রত্যেকের মাথায় এক একটা কাল্লোং বারেং যার যার গৃহস্থলী.....। দেখতে দেখতে দিন সপ্তাহের মধ্যেই শত শত বছরের পাড়া, ভিটেমাটি, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর কর্ণফুলী ফুলে ফেঁপে ওঠা জলের গভীর অতলে ডুবে যেতে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যে পুরো জুরাছড়ির এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেলো। আমরা বসতি গাড়লাম পুরোনো ডুবে যাওয়া গ্রামের ঠিক সোজা পশ্চিমে পাহাড়ে। যে গ্রামটি বর্তমানে জুরোছড়ি এলাকায় বনগোগীছড়া নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এক সময়ের বিশাল এলাকা লোকালয়ে ভর্তি ভূ-ভাগ পরিণত হলো কুল কিনারাহীন সাগরসম অথৈ জলাধারে"।

সুতরাং জুরাছড়ির বনযোগিছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি সদস্যযারা তারা ইতিহাস সচেতন না হয়ে পারেনা। জুরাছড়ি ক্রমবিকাশের ইতিহাস, জুম্ম জাতি ক্রমবিকাশের ইতিহাস,

তথা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকাকে বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরীগণ সবচেয়ে ঘৃনার চোখে বিচার করবেই।

১৯৯৭ এর ২ ডিসেম্বর জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে এক পর্যায়ের উত্তরণ ঘটেছে। জুম্ম জাতি ক্রমবিকাশের বাঁকে বাঁকে জুরাছড়ির অগ্রণী সন্তানগণ তাঁদের ঐতিহাসিক দায়দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন অপরাপর অঞ্চলের অগ্রণীদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। জুম্মজাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জুরাছড়ির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁরা, তাঁদের পদভারে আতঙ্কের কারণ হয়েছিল কায়েমী ব্যবস্থার আর বিপ্লবীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল দুর্বার মনোবল। জুরাছড়িতে জন্মনেয়া জুরাছড়ির আলো বাতাসে আর পরম মমতায় বেড়ে ওঠা এম, এন, লারমার চিন্তা চেতনায় উদ্দীপিত যোদ্ধারা জুরাছড়ি সীমানা ছাড়িয়ে জুরাছড়ি মুক্তিকামীদের প্রতিনিধি হয়ে বাকী সংকল্প বদ্ধ সংগঠন ও ইউনিট সমূহে একাত্মা হয়ে একই আদর্শে সজ্জিত সহযোদ্ধাদের সাথে জুম্ম জাতির সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার সকল প্রতিবন্ধকতা পরোয়া না করে নির্ভীকতায় কর্মনৈপুন্যে জুরাছড়ির মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এবং এটা করেছিলেন সংগঠনের চার মহান শৃংখলাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে।জুম্ম জাতীয়তা বাদের প্রতি সম্মান করে উগ্রজাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সংকীর্ণ চিন্তা চেতনার কানা গলিতে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সবচেয়ে অগ্রসর সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবতাবাদ ও সমতা প্রতিষ্ঠার সংকল্পে এগিয়ে গিয়েছেন প্রতিবন্ধকতার সহিত বোঝাপাড়া করে, সেটা হোক মনুষ্যসৃষ্ট কিংবা প্রকৃতির খেয়াল। তাতে তারা দমে যাননি। তবে প্রকৃতিকে ধবংস করে নয় প্রকৃতির শক্তির নিকট মানুষ কিন্তু অসহায়।প্রকৃতিকে ভালোবেসে ,সংরক্ষন করে জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলো তারা পেরিয়ে এসেছেন। এতে করে তাঁদের জীবনের বসন্ত গুলি হারিয়ে গেছে।পরোয়াহীন জীবন সংগ্রামে তাদের হুস হয়নাই।

মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতাগুলো কঠোর এবং কঠিন হয়ে উঠত। বুঝাপারা করতেগিয়ে নেমে আসত বিপর্যয়। সংগঠনের সবচেয়ো মূল্যবান সম্পদ- সুখ দুখের সংগ্রামী সাথী আর্দশবান সহযোদ্ধার শহীদান অনিবার্য হয়ে উঠত। আত্মবলিদানকারী পদমর্যাদায় যে হোন সংগঠনের সর্বনিম্ন ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ সংস্থা এতে করে মুহ্যমান হয়ে উঠত। একই আর্দশ ও চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং যাঁর উপস্থিতিতে ইউনিতের সুখ দূঃখের দিনগুলো উপভোগ্য হত ,আর সবচেয়ে ওজনদারী ও কঠিন কাজ ভাগাভাগিতে হয়ে উঠত সবচেয়ে সহজ কাজ , এমন কমরেড হারানোতে সংগঠনের বহুমাত্রিক ক্ষতি হয়ে যেত। শোক সভা ডাকা হত। কোন কোন মৃত্যু অত্যন্তভারী হয় আর কিছু মৃত্য হয়ে থাকে হাঁসের পালকের চেয়ে হালকা। জনগনের মুক্তির জন্য মৃত্যবরণ করা এবং এই মৃত্যু অবশ্যই কেওক্রাডং পাহাড় ও ফুরোমোন পাহাড়ের চেয়ে ভারী আর শাসক-শোসক ও প্রতিক্রীয়াশীল পক্ষহয়ে মৃত্যবরণ করাকে অবমানকর এবং মূল্যহীন মৃত্যু হিসাবে মূল্যায়ন করাহত।

শোক হয়ে উঠত শক্তি। প্রতিশোধ এর ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে তাঁরা হয়ে উঠত আরও অপ্রতিরোধ্য। সংগঠনের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের শেষে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে তার রেখে যাওয়া দলীর সম্পদের উপকরণ গুলি আর এক যোদ্ধার হাতে তুলে দেয়া হত, সেও তখন হয়ে ওঠত মরণজয়ী বীর। এভাবে চলেছিল দিন মাস আর বছর পেরিয়ে ইতিহাস সৃষ্ঠির পথ চলা, যে পথের শেষ অনাগত দিনের নিকট সংরক্ষিত।

মহাননেতা এম, এন, লারমা তিনগুন সম্পন্ন যোদ্ধা হওয়ার জন্য তারা সদাসচেষ্ট ছিলেন এবং এতে করে নিজেকে একজন সাচ্ছা লারমা সৈনিক হওয়ার জন্য সমাজকে বদলাবার সাথে নিজেকেও তারা বদলিয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল আর মানবতাবাদের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান দিয়ে নির্নয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের কে শত্রন এবং মিত্র কারা আর এ সড়্গামতা অর্জন করা এখানেই হচ্ছে বিপ্লবের সবচেয়ে ব্যবহারিক সঠিকতা। মহান জনতার নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা, কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রমী ও সহজ পদ্ধতি অনুসরণ এবং নীতির মোহে আর নমনীয় কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈপুন্য অর্জ্জনের মধ্যদিয়ে তারা হয়ে উঠেছিলেন অজেয়।

মহাননেতার শিক্ষাগ্রহনের গূন আয়ত্বের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি প্রসারিত করেছিল ইনকা সভ্যতা, মিশরের সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, চীনের সভ্যতা ইতিহাস অধ্যায়ন করে। তাদের চোখে ফরাসি বিপবের সফলতা ও বিষ্ফলতা রূপরেখা। সক্রেটিস আর ব্রন্ননোর আত্নত্যাগ, চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক তারন্নন্য তাদের রজে বেহমান মাস্টারদা সূর্যসেন প্রীতিলতা ও ড়্গাদীরামের আকুতি, মেহনতি মানুষের মুক্তির শ্রষ্ঠতাত্বিক সনদ কালজয়ী ইস্তেহার, অক্টোবর বিপস্নবের 'অরোরা' রণতরীর ঐতিহাসিক কামানের গোলাবর্ষণ, মাও-সেতুঙের অপ্রতিরোধ্য মহাকাব্যিক লং মার্চ, মুক্তি কামীদের অনির্বাণ শিখা হো চি মিনের ভিয়েতনাম। মানবতার শক্তি এগিয়ে চলেছে, জুম্মজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ,অস্তিত্ব টিকে রাখার সংগ্রাম এগিয়ে এই এগিয়ে যাবার নিরন্তর সংগ্রামে জুরোছড়ির বনযোগিছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সংকল্পবদ্ধ হবেই। চলেছে এবং এগিয়ে যাবে । এগিয়ে যাবার লক্ষ্য বিজয় অর্জ্জন করা।

সহায়ক:

১. প্রবন্ধ 'বরপরং', প্রিয় কুমার চাকমা চিজি- (স্মৃতি কথা) দ্বিতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক সম্মেলন-২০১৬ স্মারক সংকলন।
২. এম, এন, লারমা এর তিনগুন- ক্ষমার গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ-

.....

ধর্মকীর্তি চাকমা , বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার রাঙ্গামাটি।

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

বিংশ শতাব্দী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি সাহিত্য চর্চার নবজাগরণ

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান-এ তিনটি জেলাকে বাংলাদেশের 'পার্বত্য অঞ্চল' বলা হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এ তিনটি জেলা ***'পার্বত্য চট্টগ্রাম'*** নামে একটি স্বতন্ত্র জেলা ছিল যা ১৮৬০ সালে গঠন করা হয় । ১৮৬০ সালের ২০ জুন তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-৩৩০২ অনুসারে 'রেইড অব ফ্রন্টিয়ার্স ট্রাইবস অ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়। বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেশের মূল ভূ-খন্ডের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল যার বর্তমান আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল। এ ভূ-খন্ডটি এক সময় ***'কার্পাসমহল'*** নামেও পরিচিত ছিল। তবে এটিকে বৃটিশ শাসনামলে অফিসিয়ালি ***'শাসন বহির্ভূত অঞ্চল'*** (Excluded Area) এবং পাকিস্তান আমলে ***'উপজাতি অঞ্চল'*** (Tribal Area) হিসেবেও বলা হত। পার্বত্য অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল থেকে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, চাক, খিয়াং, পাংখোয়া, খুমী এবং লুসাইসহ ১১টি জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এসব নৃ-জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে স্বতন্ত্র বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভাষা, দৈনন্দিন চাল-চলন, খাদ্যোভ্যাস, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদিতে স্বাতন্ত্রিকতা লক্ষ করা যায়। তাদের রয়েছে আলাদা সঙ্গীত ও নৃত্য। সঙ্গীত ও নৃত্যে আদিম সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মোট কথা তাদের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য দেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে আরো বর্ণাঢ্য ও রঙীন করেছে। তবে এসব জাতি-গোষ্ঠী দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে শুরম্ন করে সকল বিষয়ে পূর্বেও পিছিয়ে ছিল এখনো রয়েছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নৃ-জাতি গোষ্ঠীদের পরিচয় নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই। পূর্বে উলেস্নখ করেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি জাতি বসবাস করে থাকে। সরকারিভাবে এদের পরিচয় হচ্ছে ***'উপজাতি'***। ইংরেজিতে বলা হয় ***Tribe***। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'-এ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮) ***'উপজাতি'*** অর্থ দেওয়া হয়েছে-১. প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র জাতি ২. পাহাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়। Oxford Advanced learner's

Dictionary(7th edition)-তে Tribe-এর অর্থ দেওয়া আছে (In developing countries) a group of people of the same race, and with the same customs, language, religion, etc., living in a particular area and often led by a chief : tribes living in remote areas of the Amazonian rainforest. প্রতীয়মান হচ্ছে ইংরেজিতে যাদের ***Tribe*** বলা হয় বাংলায় ***উপজাতি*** বলতে অন্য অর্থ বোঝানো হয়। কাজেই ***Tribe*** অর্থ উপজাতি যে একেবারে মানতে হবে তা সঠিক নয়। বরং ইংরেজিতে ***Tribe***-এর যে অর্থ করা হয়েছে পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাসকারী জাতিদের বেলায় ***Tribe*** অনেকটা প্রযোজ্য কিন্তু ***উপজাতি*** নয়। কারণ এসব জাতি-গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর জাতির শাখা বা ক্ষুদ্র জাতি নয়। তাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য রয়েছে। রয়েছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক নিজস্ব পরিমন্ডল। ইদানিং আদিবাসীও বলা হচ্ছে। এ শব্দটি ইংরেজি ***Indigenous***-এর সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালে ৯ আগস্ট-কে International Indigenous Day ঘোষণা করার পূর্বে এ শব্দটি তাদের মধ্যে প্রচলন ছিল না। উপরে বর্ণিত অভিধানে 'আদিবাসী'-এর অর্থ করা হয়েছে-আদিম জাতি বা অধিবাসী। অপরদিকে Oxford Advanced learner's Dictionary(7th edition)-তে ***Indigenous*** শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে-Belonging to a particular place rather than comimg to it from somewhere else. এক্ষেত্রেও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ***Indigenous*** শব্দটির সাথে বাংলা ***'আদিবাসী'*** শব্দটি সমার্থক নয়। মোট কথা হচ্ছে এসবের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এসকল জাতিদের জাতি হিসেবে স্বীকার না করার কৌশল বিরাজমান রয়েছে। আমরা অতীতে দেখি তাদেরকে সাধারণ পরিচয়ে 'পাহাড়ি' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ইংরেজরাও বলতো ***Indigenous Hill Man***.। এটি অনেকটা সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া শত শত বৎসর ধরে পাহাড়ি এলাকায় বসবাসের ফলে তারা যে সকল বৈশিষ্ট্য লালন করে থাকে সেদিক থেকে ***'পাহাড়ি'*** শব্দটি উপযুক্ত বলে মনে হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এসকল দিক বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নৃ-জাতিদের ***'পাহাড়ি'*** হিসেবে পরিচয় করা হল এবং এ প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীতে তাদের সাহিত্য চর্চার দিকটি তুলে ধরার চেষ্ঠা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের মধ্যে যে সাহিত্য চর্চা হয়েছে তা বিশ্ব সাহিত্যের লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেলেও তা অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কাছে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। এ কথা সত্য যে, পাহাড়িদের চাল-চলন, চিন্তা-চেতনা এবং কাজে-কর্মে এখনো কোন কোন ক্ষেত্রে আদিমতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগের সংস্পর্শে এসে শত শত বৎসর ধরে লালিত চিন্তাধারায় একটি মিশ্র ভাবধারা এবং চিন্তা এসে সংযুক্ত হয়েছে যার প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে এবং পাচ্ছে। এ ধরনের সাহিত্য কর্মে সাধারণত ভিন্ন আমেজ থাকে। মানের দিক বিবেচনা করলে আমরা হয়তো এর স্বাদ অনুভব করতে পারবো না কিন্তু সৃষ্টিশীলতা এবং সৃজনশীলতাকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তা হলে এর গুরম্নত্ব অপরিসীম।

এগুলো অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। আলোচ্য আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ২%। ১৯০১ আদমশুমারিতে (Census Report) দেখা যায়, চাকমাদের মধ্যে ২১৫৬ জন পুরুষ এবং ৪৪ জন মহিলা শিক্ষিত। এ সংখ্যাতে যাদের অক্ষরজ্ঞান রয়েছে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭৮৮ জন পুরুষ ও ২৪ জন মহিলা বাংলা এবং ৫৫ জন পুরুষ ইংরেজি জানত। অবশিষ্টরা চাকমা ভাষা লিখতে ও পড়তে পারত। অপরদিকে যারা বাংলা পড়তে পারে তাদের মধ্যে ২৯৪ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা চাকমা বর্ণমালায় পড়তে পারে। ১২ জন পুরুষ মগ (মারমা বা বার্মিজ) ভাষাও পড়তে পারত। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ৪% এর মত। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য পাহাড়ি জাতিদের শিক্ষার হার আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। এ আদমশুমারীতে হিন্দু ও মুসলমান-এ দু'টো ভাগে শিক্ষার হার দেখানো হয়। এতে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে হিন্দুদের শিক্ষার হার ৫.৯% এবং মুসলমানদের ৬.৩%। সম্ভবত হিন্দুদের মধ্যে পাহাড়িদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত আদমশুমারীতে ধর্মীয়ভাবেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। মি. R.H. SNEYD HUTCHINSON তার ***CHITTGONG HILL TRACTS*** গ্রন্থে লিখেছেন ' Male education is much further advanced than might have heen expected as 79 persons per 1000 can read write.' তাছাড়া চাকমা ব্যতিত অন্যান্য জাতির মধ্যে শিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক ছিল না বললেই চলে। ফলে তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পাহাড়ি জাতিগুলোর মধ্যে লোকসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। চাকমাদের এ নগন্য সংখ্যক শিক্ষিতের মধ্যে সাহিত্য চর্চা স্বাভাবিকভাবে হবে না তা এক বাক্যে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে একটি বিষয় সন্তোষজনক যে, তৎকালীন সময়ে চাকমা বর্ণমালায় অনেকে পড়তে জানত। যার ফল আমরা বিভিন্ন কাব্য রচনায় দেখতে পাই। কালক্রমে চাকমা বর্ণমালায় পড়তে জানা লোকের সংখ্যা কমতে থাকে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীন জেলা সদর ***'চন্দ্রঘোনায়'***। এ স্কুলের নাম ছিল ***'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল'***। স্কুলে চাকমা ও বার্মিজ ক্লাশ নামে ২টি ক্লাশ ছিল। শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণে স্বভাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চা দেরিতে শুরুন হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য চর্চা কম হবে-এটাও স্বাভাবিক। তবে আনন্দের খবর এই যে, বিংশ শতাব্দী থেকে এসব জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যখন শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে শুরুন করে এবং তা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাদের আধুনিক সাহিত্য চর্চাতেও পদার্পন শুরুন হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়িদের মধ্যে বিশেষত চাকমাদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য চর্চা শুরুন হয়। তবে দেরিতে আধুনিক সাহিত্য চর্চা শুরুন হলেও তাদের লোকসাহিত্য ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ-একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। এসকল লোকসাহিত্যে তাদের সমৃদ্ধ জীবন প্রণালী এবং গভীর জ্ঞান সম্পর্কে

ধারণা পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার আলো তাদের সমাজে পৌঁছার পর থেকে তারা আধুনিক সাহিত্য চর্চায় মনযোগী হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে চাকমাদের সাহিত্য চর্চার বিষয়গুলো বেশি পরিমাণে উঠে আসবে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি পাহাড়ি জাতির মধ্যে চাকমারা শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল বিষয়ে এগিয়ে রয়েছে। আরো লক্ষ্যনীয় ব্যাপার যে, ম্রো, খুমীসহ বেশ কয়েকটি জাতির আধুনিক সাহিত্য চর্চা শুরুন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজের বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক সুহৃদ চাকমা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত তাঁর এক প্রবন্ধে চাকমা সাহিত্যের কালকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ- ১. প্রাচীন যুগ (১৩০০-১৬০০), ২. মধ্য যুগ(১৬০০-১৯০০) এবং ৩. আধুনিক যুগ(১৯০০-বর্তমান)। প্রাচীন যুগ এবং মধ্য যুগের সময়কালকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগের সময়কে যথার্থ বলে মনে হয়। চাকমাদের বিভিন্ন বারমাসিগুলো কখন রচিত হয়েছিল তার সঠিক সময় এখনো জানা যায়নি কাজেই সাহিত্যের প্রাচীন যুগ এবং মধ্য যুগ নির্ণয় করা কঠিন। অন্যান্য পাহাড়ি জাতিদের বেলায়ও একই কারণ হতে পারে বলে মনে হয়। একই ভূ-খন্ডে এবং এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার কারণে পাহাড়ি জাতিরা একই সময়ে শিক্ষার আলো লাভ করে। তবে চাকমাদের আধুনিক সাহিত্য অন্যান্যদের চেয়ে আগে যাত্রা শুরুন করেছিল বললে ভুল বলা হবে না।

উল্লেখিত ভাগ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সাহিত্যকে শ্রেণী অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এ দুটি ভাগ হচ্ছে-১. পাহাড়িদের নিজস্ব মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা এবং ২. বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংবাদপত্র বিষয়ে বিশিষ্ট্য গবেষক নন্দ লাল শর্মা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্য চর্চার কালকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ- ক) দেশবিভাগ পূর্ব যুগ (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) খ) দেশবিভাগ উত্তর যুগ এবং গ) স্বাধীনতা উত্তর যুগ। সাধারণত পাহাড়িদের মধ্যে বাংলা এবং তাদের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য চর্চা অব্যহত রয়েছে। ফলে একই ব্যক্তির দুটি ভাষায় সাহিত্য কর্ম রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্ত্বাদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা চর্চা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলে নিজস্ব ভাষা ও বর্ণে সাহিত্য চর্চা করে পাহাড়িদের মধ্যে অনেকে আত্মতুষ্টি করছেন। যদিও ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক পূর্ব থেকে নিজস্ব ভাষা ও বর্ণে সাহিত্য চর্চা অব্যহত রয়েছে পাহাড়িদের মধ্যে। নন্দ লাল শর্মা লিখেছেন,***"দেশ বিভাগ পূর্বযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চা ছিল মূলতঃ 'গৈরিকা' কেন্দ্রিক। বলা যায় এখানে বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রথম সযোগ আসে 'গৈরিক'কে কেন্দ্র করেই। ----------গৈরিকার লেখক নন অথচ দেশ বিভাগোত্তর যুগে সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন লেখকের সংখ্যা স্বল্প।"*** গৈরিকায় যারা সাহিত্য চর্চা করেছিলেন তারা হলেন-প্রভাত কুমার দেওয়ান, অরূণ রায়, কুমার কোকনদাক্ষ রায়, বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, রাণী বিনীতা রায়, অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান, কালাঞ্জয় চাকমা, ঘনশ্যাম দেওয়ান, ভগবান চন্দ্র বর্মণ, কুমার বিরূপাক্ষ রায়, গোপাল চন্দ্র গুর্খা, তনুরাম খীসা, নীলা রায়, বিপুলেশ্বর দেওয়ান, রাজা নলিনাক্ষ রায়, চুনী লাল দেওয়ান, শান্তিময় রায়, গোপাল চন্দ্র গুর্খা, সুনীতি জীবন খীসা, গিরীন্দ্র বিজয় দেওয়ান, নীরোদ রঞ্জন দেওয়ান, কুমার রমণী রায়, সলিল রায়, মুকুন্দ

তালুকদার, জগদীশ চন্দ্র বর্মণ ও রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার। এসকল ব্যক্তিদের মধ্যে অরন্নণ রায়, সলিল রায়, রাণী বিনীতা রায়, বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান, কুমার কোকনদাক্ষ রায়, প্রভাত কুমার দেওয়ান, চুনী লাল দেওয়ান প্রমুখ ব্যক্তিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক সাহিত্য জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মধন চাকমা (ধর্মধন পন্ডিত), পুষ্প মনি চাকমা, প্রবোধ চন্দ্র চাকমা (ফিরিং চান), চুনী লাল দেওয়ান, শরৎ চন্দ্র রোয়াজা, হর কিশোর চাকমা, কবি অরন্নণ রায়, সলিল রায়, রাণী বিনীতা রায়, প্রভাত কুমার দেওয়ান, কুমার কোকনদাক্ষ রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্যের পথিকৃৎ।

বিংশ শতাব্দীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী পাহাড়িদের জন্য আধুনিক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বলা যেতে পারে। এ শতকেই পাহাড়িদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্য চর্চা শুরন্ন হয়। এসকল সাহিত্য কর্ম হয়তো কখনো প্রকাশিত হয়েছে বা কখনো হয়তো প্রকাশ হয়নি। এর কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর ৭০ দশক পূর্ব পর্যন্ত্ম কোন মুদ্রণের ব্যবস্থা না থাকা এবং বাজারজাতকরণ তথা পাঠকের অভাব। চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বই মুদ্রণ করে আনা তৎকালীন সময়ে ছিল দুরূহ ব্যাপার। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত্ম খারাপ। এর মধ্যে চট্টগ্রামের কোন একটি প্রেস থেকে প্রবোধ চন্দ্র চাকমা (ফিরিং চান) ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চাকমা ভাষায় লিখিত অমর কবিতাগ্রন্থ ***'আলসি কবিতা'*** (আলসে কবিতা) নামক বইটি মুদ্রণ করতে সক্ষম হন। কাব্যগ্রন্থের বিচারে এটিকে ঠিক কাব্যগ্রন্থও বলা যায় না। তবুও এটি কাব্যগ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। গ্রন্থের বিভিন্ন শিরোনামে তিনি চাকমা অলস মহিলা ও অলস মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি তিনি পয়ার ছন্দে রচনা করেছিলেন। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম ***'চাকমা কাব্যগ্রন্থ'***। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। পাহাড়িদের লিখিত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়-এর ***'চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস'*** (প্রকাশকাল ১৯১৯ খ্রিঃ)। প্রবোধ চন্দ্র চাকমা তাঁর ***'আলসি কবিতা'র*** কাব্যে অলস মানুষকে নিয়ে লিখেন-

আলসি মানস্যর লুভধাব নেই আলসির নথায় হৈজ
যত্তন তাজিব আলসির নেই আলসির নথায় পোজ।
আলসির নথায় চেত্তন চেরেষ্টা আলসির নথায় দয়া
লালস কেলস আলসির নেই আলসির নথায় মেইয়া।
আলসি মানস্যর জিতঘিন নেই আলসির নথায় ভাজ
সাহস ক্ষেমতা আলসির নথায় আলসির নথায় কাজ।
আলসির মানস্যর লাজকর নেই আলসির নথায় মান
নিতি ধর্ম্ম আলসির নেই আলসির নথায় মান।

অনুবাদ

আলসে লোকের আগ্রহ নেই আলসের নেই সাধ

আলসে লোকের যত্ন নেই তার কাজে নেই সাজ।
আলসের নেই কোন চেষ্টা আলসের নেই দয়া
সাধ আহ্লাদ আলসের নেই আলসের নেই মায়া।
আলসে লোকের তেজ নেই তার নেই কোন লাজ
সাহস ক্ষমতা আলসের নেই তার নেই কোন কাজ।
আলসের লাজ নেই তাই তার নেই কোন মান
ধর্ম বলতে তা কিছু নেই করে না সে কোন দান।

প্রবোধ চন্দ্র চাকমা তাঁর আলসি কবিতায় ***'কবিতা আরাম্ভ'*** শিরোনামে একজন অলস মানুষের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এ কাব্যটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যকে উচ্চ আসনে আসীন করেছে। এই কাব্যে তিনি ***'আলসি মিলার কথা'*** (আলসে মহিলার কথা) অংশে লিখেন-

আলসি মিলা ঘুমত্তুন বেল উদিলে উধে
মুদর শূলে মুদা শালৎ যেই ন তাঙততে মুদে।
আলসি মিলাই পত্তি দিনে দিনত যাইবো ঘুম
পানি নেইয়া রোদে ধুপ হয় আলসি মিলার কুম।
আলসি মিলাই গাঙত গেলে কুম কুত্তি ন কেজে
আগে ফুলে পানির জলে হেইল করিয়া ধরে।
জালে ধর্য্যা কুম কুত্তি আলসি মিলার থায়
ঘিন কাতচ্যা মানস্যে দেলে পানি ন খেই যায়।

এ অংশেও তিনি একজন আলসে মহিলার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ কাব্যে মূলতঃ একজন চাকমা আলসে মহিলার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে।

চাকমা সমাজে পন্ডিত বলে খ্যাত ধর্মধন চাকমা'র ***'চান্দবী বারমাস'*** অমর কাব্যটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্য কর্ম বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ রূপবতী চান্দবী'র বিচারকার্য চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় (রাজত্বকাল ১৮৯৭-১৯৩৩) রাঙ্গামাটি চাকমা রাজবাড়িতে সম্পন্ন করেছিলেন। ধর্মধন চাকমা এ কাব্যটি অনেকটা প্রাচীন বাংলা ভাষায় চাকমা বর্ণে রচনা করেছিলেন রূপবতী চান্দবী'র জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে। এটি পুস্ত্মকারে প্রকাশিত না হলেও তৎকালীন চাকমা সমাজে তা অনুলিপি হয়ে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন চাকমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কাব্যের **'রূপ বন্দনা'** নামক শিরোনামে ধর্মধন লিখেন-

হাদত বালা সুন্দর চান্দ খনজনে বাড়ায় পা
যবুনবালা সুন্দর চান্দ কুগিলাই কারে রা
কি কহিমু চান্দবীর রূপের কথা স্বরূপ বাখান
কোটি কোটি তারা জিনি চান্দের সমান।

কিবা লক্ষ্মী স্বরস্বতী কিবা কামবান
রূপে তিরস্কার করে শত শত চান।

ধর্মধন চাকমা'র ***'মলি কবিতা'***টিও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ কবিতায় কবি *মলি* (Yeast জাতীয় জিনিস) তৈরি করা থেকে মদ তৈরি করার পদ্ধতি এবং মদ খাওয়ার পরিনাম কাব্যসুরে বর্ণনা করেছিলেন দক্ষতার সাথে। এ কবিতাটিও তৎকালীন কোন সংবাদপত্র কিংবা কোন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়নি। তবে এ কবিতাটি একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে কপি হয়ে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন চাকমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই তারা মুখস্থ করে ফেলেছিল। কারণ কাব্য মুখস্থ হতে কষ্টসাধ্য ছিল না।

অগ্নিনেত্তে তুলে ভাদি পাককোন দিব টাঙি
একটি বাশে লককাই দিব বেড়াই দিব কানি।
শিরেই দিব গড়া লিবি
শিরেই দিব গড়া লিবি তলেদি ফাদে ঘড়া
অগ্নিনির তব পায়ে মদ পড়ে থরা থরা।
তবে মদ পাক অইল
তবে মদ পাক অইল দেখিল সকলে
ভাদি লামাই আনি গড়ান দিল শূগররে।

কেহ খায় গলস দিয়া কেহ ধরে কাপ
না চিনিবো গুরন্নজন না চিনিবো বাপ।
তবে চে লেংদা অইবো নাচ গরিবো সবার বিদ্যুমান
এইদ কারনে লোক হারাইবো সম্মান।
কবিদা সাঙ্গ অইল ভঙ্গ অইল না করিও ইস
এই কবিদে জরাইয়াছে ধর্মধন পন্ডিত।

চান্দবী বারমাস কাব্যটির পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কাব্যটি রচিত হয় সেটি হচ্ছে পুষ্প মনি চাকমা'র ***'চিত্ররেখা বারমাস'*** কাব্যটি। জনৈক চিত্ররেখা সুন্দরীর প্রেম কাহিনী এ কাব্যের বিষয়বস্তু। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এটি রচিত। গৈরিকা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম ***'সংবাদপত্র'*** যেটির নাম বিশ্বকবি রবীন্দ্র ঠাকুর দিয়েছিলেন। পুষ্প মনি চাকমা 'চিত্ররেখা' বারমাসের ***'অতঃ অগ্রাইয়ন মাসের বিবরণ'*** (চিত্ররেখার সহিত কান্দারার মিলন) লিখেন-

আগ্রন মাসেত্তে চিত্র সদাই রংগ মন
খন্ডন না যায় কভু বিধির লিখন।
কদেক্ক কহিব তার রূপের কথন
এখনে কইয়া দিম্মুই কান্দারার মিলন।

দৈব যোগে গেল চিত্র জলের কারণ
সেই দিনে কান্দারার সংগে ঐল দরশন।
জল ঘাটে দুই জনে যখনে মিলিল
মদন বিচিত্র সুরে তগনে দংশিল।

অনিরন্নদ্ধ নামে ছিল কামের তনয়
গুপনে উষার সংগে কল্ল্য পরিনয়
গুপনে থাকিয়া গর্ভ ধরে তারপর
দৈত্য সংগে যদু বংশ অইল সমর।

এদেক্ক শুনিয়া চিত্র হেত কল্ল্য মাথা
লজ্জায়ে বদনে আর নাই সরে কথা।
হাতেত্তে ধরিয়া পুন্ন তুলিলেক্ক কুলে
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে।

চিত্ররেখা বারমাস কাব্যটি পুষ্প মনি চাকমা শেষ করেছিলেন এভাবে-

গম্ভির গৌরব তার পন্ডিত সভায়
পাইয়া সেথায় চলে শ্রি গুরন্নর কৃপায়।
তের শত দশ সনে নানান ছত্র লয়া
বারই(শাস্ত্র) মত্তে পুস্ত্মক রচিয়া।
প্রথম বৈশাগ্রণ দিনে করিলাম প্রচার
শ্রি গ্ররন্ন কমল পদে বন্ধি এগবার।
অশুদ্দ হইলে মুরে ক্ষমিবা সগলে
জ্ঞানিগণ পদে ধরি মুর্খ বলে।

এতক্ষণ আমরা বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, পূর্বে চাকমারা শুধুমাত্র কাব্য চর্চা করত। বিভিন্ন বারমাসি এবং ভারত রামায়ণও পড়ত। আর যাদের একটু লেখার অভ্যাস ছিল তারা বিভিন্ন বারমাসি লেখত। এজন্য চাকমাদের মধ্যে আমরা ***চান্দবী বারমাস***, ***চিত্ররেখা বারমাস***, ***মেয়েবী বারমাস***, ***মা-বাব বারমাস***, ***সৃষ্টি বারমাস***সহ বারমাসির আদলে রচিত ***'কলি চদিজা'*** এবং ***'রাধামন ধনপুদি পালা'***, ***তান্যাবী পালা***সহ আরো কত রকমের পালা দেখতে পাই। উলেস্নখিত রচনাগুলোতে চাকমা ভাষার সাথে আমরা মধ্যযুগীয় বাংলার সংমিশ্রণ দেখতে পাই। অবসরে এসব পালা বা বারমাসি পড়ে পড়ে চাকমারা সময় কাটাত।

প্রবোধ চন্দ্র চাকমা'র ***'আলসি কবিতা'*** র পরর্তীতে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকাশিত হয় পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা'র বাংলাভাষায় রচিত ***'ধর্মধ্বজ জাতক'*** নামক বইটি। তিনি ছিলেন মূলত একজন কবিরাজ। তাঁর একটি হ্যান্ডপ্রেস ছিল। ঐ প্রেস থেকে তিনি তার কবিরাজী সম্পর্কে বিজ্ঞাপন ছেপে প্রচার করতেন। তাঁর হ্যান্ডপ্রেস থেকে তিনি ***'ধর্মধ্বজ জাতক'*** নামক বইটি ছাপেন। এটি মূলত বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ক জাতকের কাহিনী নিয়ে পয়ার ছন্দে রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের'র ধর্মীয় নাটক ***'পরিণাম'***, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা'র বাংলাভাষায় প্রকাশিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ক কবিতা গ্রন্থ ***'উদয়ন বস্তু'***, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বরেন ত্রিপুরা'র গানের বই ***'অজানা পাহাড়ি সুর'*** রাজমাতা বিনীতা রায়-এর ***'গ্রামের কল্যাণ'*** (১৯৬৩ খ্রিঃ) উল্লেখ্যযোগ্য। বরেন ত্রিপুরা'র 'অজানা পাহাড়ি সুর' গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাদের রচিত প্রথম বই। এমনকি এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশিত প্রথম গানের বই। ত্রিপুরাদের মধ্যে সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। তিনি একাধারে গবেষক, গীতিকার ও সাহিত্যিক। তাঁর রচিত অনেক ত্রিপুরা গান রয়েছে। তাঁর আপন কনিষ্ঠভ্রাতা মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরাও ত্রিপুরাদের মধ্যে পরিচিত একজন সাহিত্যিক। তিনি গান ও কবিতা লিখে থাকেন। এছাড়াও, রাজা দেবাশীষ রায়, শান্তিময় চাকমা, পরামানন্দ চাকমা, সমিত রায়, বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা, কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, ক্য শৈ প্রু, প্রভাংশু ত্রিপুরা, নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, শোভা ত্রিপুরা প্রমুখগণের নাম পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য জগতে পরিচিত নাম।

সাহিত্যকর্ম বিকশিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হলে তো কথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন সংবাদপত্র তথাপি কোন সাময়িকী প্রকাশিত না হওয়ায় পাহাড়িদের জন্য সাহিত্য চর্চা করা দুরূহ ছিল। চাকমা রাণী বিনীতা রায়-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'গৈরিকা' প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশের বন্ধাত্বতা কেটে যায়। অথচ বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-খন্ড থেকে ***'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'*** নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান রংপুর জেলা থেকে। এতে বোঝা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অপরাপর এলাকা থেকে কত পিছিয়ে ছিল। অদ্যাবধিও পিছিয়ে রয়েছে-একথা স্বীকার করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়িদের মধ্যে গদ্য সাহিত্যের সূচনা অনেকটা রাঙ্গামাটি চাকমা রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত ***'গৈরিকা'***র মাধ্যমেই সূচিত হয়েছিল। গৈরিকা পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন শিক্ষিত পাহাড়ি সমাজ সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ পায়। পার্বত্য চট্ট্রগ্রামে গদ্য সাহিত্যের সূচনা অনেকটা গৈরিকা'র মাধ্যমে হয়েছিল এ কথা বলা যায়। ছোটগল্পের রচনা করার চর্চাও আমরা প্রথম গৈরিকা পত্রিকায় দেখতে পাই। গৈরিকায় লিখে অনেকে হাত পাকিয়েছিলেন। গৈরিকায় বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত শিল্পী চুনী লাল দেওয়ানের ***'ঘর দুয়ারত'*** কবিতাটি উপজাতীয় ভাষায় লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম উপজাতীয় আধুনিক কবিতা বলে বিবেচিত। এটি চাকমা ভাষায় রচিত।

ঘর দুয়ারত

ঘর দুয়ারত এইনাই ডাগে
সিবা কন্না মোরে,
মুয়ান চিনং নাং ন জানং
কুদু দেখ্যং তারে।
ডাগ শুনিনায় ফুরি পেল্লুং
যেদক্যানি মোর কাম,
পরাণে কত্তে তারে চেইনায়
ফুজার গুত্তুং নাং।
ফুজার গরি চিন পরিচয়
তাল্লই যদি অই,
আওস গরি ভিদরে বজি
দ্বিজনে কদা কই।
কদা কইনাই মনত পলে
তেবাত্যায় কোম তারে
জনমত্যায় মিলিমিজি
থেবং আমি সমারে।

বাংলা অনুবাদ

কুটীর দূয়ারে এসে ডাকে
সে কে গো মোরে,
মুখ চিনি না নাম জানি না
কোথায় দেখিনু তারে।
ডাক শুনিয়ে ভুলে গেনু
যা ছিল মোর কাজ,
সাধ হতেছে তারে ডেকে
নাম সুধাই গো আজ।
পরিচয়ের পালা শেষে
তারে ডেকে লয়ে,
সোহাগ ভরে ভিতরে বসে
কথা বলব দোঁহে।
কথা কয়ে মন মজিলে
থাকতে বলত তারে,
আমার সাথে জন্মের মত
আমার কুটীর দ্বারে। (অনুবাদ-রাণী বিনীতা রায়)

চুনী লাল দেওয়ান ছিলেন একজন হ্যাডম্যান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সম্প্রদায় থেকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন চিত্রশিল্পী। তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ফাইন আর্টস-এ ডিপেস্নামা পাশ করেন। তিনি বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন-এর সমসাময়িক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাঁর ২টি শিরোনামহীন বাংলা কবিতা পাওয়া গেছে। এ ২টি কবিতা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটি প্রকল্পনা সাহিত্যাঙ্গন ***'প্রকল্পনা'*** নামে একটি সংকলনে মুদ্রণ করেছিল।

১

গাহিতে পারে না তোমারি গান
আজি বীণাখানি মোর
তার মরমের তার
ছিঁড়ে গেছে হায় !
বিফল করিয়া সাধন তোড়।
দাও হে তোমার মোহন পরশ
উঠুক বাজিয়া হইয়া সরস
নতুন তোমার মধুর সুরে
ভেঙ্গে দিক মোর মোহ ঘোর। (৫.২.১৯৩০ খ্রিঃ)

২

চাহে আঁখি তব মেলি
হেরি একবার পুলকে আমার
হৃদয় উঠুক উজলি
কোন বিরস বদনে নয়ন মুদিয়া
ঝরা ফুল সম আছগো পড়িয়া
হৃদয় আমার দলি
আজি এ নিশীথে আলোকের মাঝে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি। (৫.৪.১৯৩০ খ্রিঃ)

চুনী লাল দেওয়ান-এর কবিতা রচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক সাহিত্য চর্চা শুরম্ন হয়েছিল এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়। তাঁর পূর্বে কোন পাহাড়ি আধুনিক সাহিত্য চর্চা করেননি। চুনী লাল দেওয়ান-এর প্রথম প্রকাশিত কবিতা হচ্ছে ***'ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে'*** । বাংলাভাষায় রচিত এটি তাঁর দীর্ঘ একটি কবিতা। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এ কবিতাটি গৈরিকায় ছাপা হয়েছিল। সাহিত্যের গুণগতমান মূল্যায়ন না করে সাহিত্য চর্চার বিষয়টি গুরম্নত্ব দিলে চুনী লাল দেওয়ানের কবিতাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য জগতে অমর হয়ে থাকবে। নব্য সাহিত্য হিসেবে পাহাড়িদের সাহিত্য কর্ম হয়তো এত উন্নত নয় কিন্তু পশ্চাৎপদ পাহাড়ি জাতিদের সাহিত্য হিসেবে এগুলো ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল। চুনী লাল দেওয়ান বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-এর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে সাহিত্য চর্চা শুরম্ন করেছিলেন। তাঁকে

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের জনক বললেও বোধয় অটুক্তি হবে না। চুনী লাল দেওয়ানের 'ঘর দুয়ারত' শীর্ষক চাকমা কবিতার পরে আমরা ১৯৫৪/৫৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে ডাঃ ভগদত্ত খীসা'র ***'দুরোত ন যেইচ সোরি'*** (সরে যেওনা দূরে) শীর্ষক চাকমা কবিতা খানি রচিত হতে দেখতে পাই। এযাবৎকালে প্রাপ্ত রেকর্ডমূলে এ কবিতাটি হচ্ছে চাকমা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় আধুনিক চাকমা কবিতা।

গৈরিকা পত্রিকাটি কখনো নিয়মিত কখনো অনিয়মিতভাবে ১৯৩৬-১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি সংখ্যায় পার্বত্য চট্রগামের কোন কোন পাহাড়ি গৈরিকায় লিখেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন কুমার কোকনদাক্ষ রায়। নাটিকা ও ছোটগল্প লেখনিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। চাকমা রাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য কোকনদাক্ষ রায় হলেন চাকমাদের মধ্যে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়িদের মধ্যে প্রথম এমএ ডিগ্রী অর্জনকারী ব্যক্তি(১৯৩৭ খ্রিঃ)। গৈরিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রায় ১৬ বৎসর পরে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম মাসিক পত্রিকা ***'পার্বত্য বাণী'*** বিরাজ মোহন দেওয়ানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর পুনরায় অনেকে সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ পায়। অনেক পাহাড়ি পার্বত্য বাণীতে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ছড়া, কবিতা লিখে সাহিত্যানুশীলন করেছিলেন। এছাড়া বিরাজ মোহন দেওয়ান নিজেই ***'সরোজ আর্ট প্রেস'*** নামক একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং উক্ত প্রেস থেকে পার্বত্য অঞ্চলের অনেকে সংকলন, বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। এতে অনেকে চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বই, সাময়িকী, সংকলন ছাপার ঝামেলা থেকে রেহাই পায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে সাহিত্যানুশীলন বৃদ্ধি পায়।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়িদের সাহিত্য চর্চার জন্য সুবর্ণ দশক বলা যেতে পারে। পাহাড়ি আধুনিক গান ও কবিতা রচনার জন্য এ দশকটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ দশকের শুরম্নতে অর্থাৎ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু শিক্ষিত উদীয়মান যুবক ***'জুভাপ্রদ'*** (জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর) গঠন করে পাহাড়ি সাহিত্যে নবপ্রাণ সৃষ্টি করেন। এ দশকে পাহাড়ি আধুনিক গান ও কবিতাসমূহ পরিপক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হয়। যদিও আধুনিক কবিতা ৪০-এর দশকে এবং আধুনিক গান ষাট-এর দশকে রচিত হওয়া শুরম্ন হয়েছিল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ৪জন কবির কবিতা রম্নশ ভাষায় অনুদিত হয়ে যে কাব্যগ্রন্থ রাশিয়া থেকে প্রকাশিত হয় তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কবি দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা'র ***'কখনো অন্যমনে'*** কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি নিঃসন্দেহে পাহাড়ি জাতিদের জন্য আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। সম্ভবত পাহাড়ি সাহিত্যের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষায় অনুবাদকৃত প্রথম কবিতা। উক্ত কবিতাটি একই বৎসর ঢাকা কলেজ বার্ষিকীতেও প্রকাশিত হয়েছিল। ***'কখনো অন্যমনে'*** কবিতাটি কোন পাহাড়ি লিখিত কবিতার বিদেশী অনুবাদ এটিই প্রথম। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে প্রেস স্থাপনের কারণে সাহিত্যানুরাগীদের জন্য সুবিধা হয়। মোট কথা হচ্ছে বিংশ

শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়িদের মধ্যে সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

কখনো অন্যমনে

কতবার মনে হয় প্রজাপতি হয়ে ভেসে যাই দূরে
নীল পাহাড়ের ঘাসে হ্রদের কিনারে,
উড়ে চলি পাখা মেলে পাতার আড়ালে মিশে যাই
জীবনের পথ ভুলে অরণ্যের সুনীল বিথারে।
হতে চাই কখনও বা উড়ে চলা একাকী পায়রা
নীলিমায় ভেসে যেতে মন চায় বারে বারে,
উদাস দুপুর বেয়ে উড়ে যাই দোয়েলের মত
সময়ের দায় ভুলে চির চেনা ব্যাথার ওপারে।
এমনটি হতে কেউ চাও কি গো তোমরা এখানে
ফুলে ফুলে ঘুরে মধুমতি ভোমরার টানে,
চন্দনা পাখিটি হতে কখনো পিপাসা জাগে যদি
হৃদয়কে করে দিও শৈশবের ইছামতি নদী।

প্রসঙ্গত উলেস্নখ্য যে, দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা'র ***'অন্তর্গত বৃষ্টিপাত'*** কাব্যগ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার **একাল প্রকাশনী** এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে। কোন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থটি হচ্ছে পাহাড়িদের প্রথম বই। এ কাব্যগ্রন্থে কবির ৪২টি কবিতা ছাপা হয়েছিল। আমরা দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা'র কবিতা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বান্দরবান থেকে প্রকাশিত ***'ঝরণা'*** সাময়িকীতে প্রথম দেখতে পাই। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল পাহাড়ি সাহিত্য একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ১৩৭৯ বাংলা সনে তিনি ***'ফুরা মোন'*** নামে একটি সংকলন চাকমা ভাষায় বাংলা হরফে প্রকাশ করেন। সংকলনের সব লেখা তাঁর রচিত। সংকলনের সম্পাদকীয় 'দ্বিয়ান কদা' শিরোনামে তিনি লিখেন " ***----সাহিত্য সংস্কৃতি এমন এক্কান জিনিষ যিয়ানিয়ে বৈষয়িক উন্নদি আনি দি ন পারে কিন্দু মানসিক উন্নদি আনি দি পারে। ----------আমাত্তুন পুরানি সাহিত্য আগে, কিন্দু সিয়ানির যুগরদাবী পুরণ করিবার খেমতা নেই। আমাত্তুন আধুনিক চাংমা সাহিত্য দরকার। চাকমা সাহিত্য ইক্কু তা জাগাআন সুপ্রতিষ্টিত গরিদ চায়। এজনা, আমা এই প্রচেষ্ঠাত তুমিঅ অংশগ্রহণ গরঅ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস লেগঅ। তমা খেমতাআনত পানি দ্য, সার দ্য, সিয়ানত্তুন নিশ্চয় ফুল ফুদিব।"*** অর্থাৎ "সাহিত্য সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যেগুলি বৈষয়িক উন্নতি এনে দিতে পারে না কিন্তু মানসিক উন্নতি এনে দিতে পারে। ----------আমাদের পুরনো সাহিত্য আছে কিন্তু সেগুলির যুগের দাবী পুরণ করবার ক্ষমতা নেই। আমাদের আধুনিক সাহিত্য দরকার। চাকমা সাহিত্য এখন তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এসো, আমাদের এই প্রচেষ্ঠায় তোমরাও অংশগ্রহণ করো। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা

কর। তোমাদের ক্ষমতায়(চারা গাছে) পানি দাও, সার দাও, সেগুলো থেকে নিশ্চয় ফুল ফুটবে।" আসলে দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা আধুনিক সাহিত্যকে উন্নতির শিখরে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চাকমা আধুনিক সাহিত্যকে কিভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো যায় এ নিয়ে ভাবতেন। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা ছিলেন আধুনিক চাকমা কবিদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি বাংলা ও চাকমা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। ৭০-এর দশকে তাঁর রচিত আধুনিক কবিতা তৎকালীন সাহিত্যানুরাগীদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। চাকমা সাহিত্যিক সুহৃদ চাকমা তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ***'দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা'র এ যাবৎ প্রকাশিত কবিতাগুলোর ভাব ও আঙ্গিক বিশ্লেষণে এ কথা সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তিনি রোমান্টিক কবি-প্রচ্ছন্ন পল্লাটোনিক প্রেমাভিসারী কবি।"*** দীপংকর শ্রীজ্ঞানের **'পাদা রঙ কোচপানা'** নামক একটি ছোট্ট কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। জুভাপ্রদ এটি প্রকাশ করে। এতে কবির ৭টি চাকমা কবিতা ছাপা হয়। কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদও দেয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর **'পাদারঙ কোচপানা'** নামক কবিতাটি। তাঁর রচিত ***'অলর গাচ্চোর পাদা লরের'***(নীরব তরঙ্গর পলস্নব দোলে) শীর্ষক একটি পান্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।

পাদারঙ কোচপানা

স্ববনানি বেক হ্লে হুয়ানি বেগ পহ্ন
আঝা নাঙ বাজানা মুরাউনে বুব নন্
কধানি কলি ধক ফুদি ফুদি ন ফুরায়
ঝর' নাঙ কানানি বুগ' জুম ভিজি যায়।
সুঘ' নাঙ নিচিদা রেদো নাঙ দুক্ পাং
ফুল' নাঙ হ্াঝানি গাঝ' নাঙ বাজি থাং
ঈদ' নাঙ জুনি রেইত গাঙানর বেই যানা
সোচ্ নয় হ্লে নয় পাদারঙ কোচপানা।

সজুজাভ ভালবাসা

স্বপ্নেরা সব নীল, শিশিরেরা দুখময়
আশা যেন বাঁচা রূপ, পাহাড়েরা বোবা নয়।
কথা যেন কুঁড়ি হয়ে ফুটে ফুটে না ফুরায়
বৃষ্টিতে কান্না, বুকে জুম ভিজে যায়।
চিন্ত্মাতে সুখ নেই রাত্রিতে দুঃখ
পুষ্পেতে হাসি ঝরে ঠিককেই বৃক্ষ।
স্মৃতি বুঝি জোনাকী, নদী শুধু বহমান
লাল নয়, নীল নয়, সবুজাভ হৃদি নাম।

প্রসঙ্গত উলেস্নখ্য যে, বিজু উৎসব উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। সে বৎসর প্রকাশিত ***'লুরা'*** সম্পাদনা করেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা এবং জুভাপ্রদ কর্তৃক প্রকাশিত ***'বিজু'*** নামের সংকলনটি সম্পাদনা করেন স. ন. দেওয়ান (সৌমেন্দ্র নারায়ন দেওয়ান)। লুরা সংকলনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে বাংলা এবং পাহাড়ি (তারা লিখেছেন মুড়াল্যা) ভাগ নামে দু'টি ভাগ ছিল। পাহাড়ি ভাগের লেখাগুলো শুধুমাত্র পাহাড়ি ভাষায় রচিত ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যকে আলোচনা করতে গেলে **জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর** (জুভাপ্রদ) সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্য সৃষ্টিতে এ সংগঠনের ভূমিকা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং আগামীতেও থাকবে। এ সংগঠনটি সম্পর্কে কিছু না বললে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সাহিত্য বিকাশে এ সংগঠনটির অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। বলতে গেলে এ সংগঠনের সদস্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্য সৃষ্টির অভিযাত্রী। কবিতা, গান, ছড়া, ছোটগল্প ইত্যাদি রচনায় তারা মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাহাড়ি ভাষায় বর্তমানে যে সাহিত্য আমরা নিভু নিভু অবস্থায় হলেও দেখতে পাই সেগুলোর প্রেরণাদাতা অনেকটা জুভাপ্রদ বললেও বোধয় অটুক্তি হবে না। তবে বাংলাভাষায় যে সকল আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি হলেছিল তা গৈরিকার মাধ্যমে সূত্রপাত হয়েছিল। মোট কথা যে, জুভাপ্রদের যে অবদান আমরা দেখতে পাই সেটিকে বাদ দিয়ে এখানকার সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আকারে ছোট হলেও এ সংগঠনের ব্যানারে অনেক সাময়িকী এবং বই প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সংগঠনের তৎকালীন সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য জগতকে আলোর দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। তাদের গঠনমূলক ভূমিকার কারণে আজ আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং সাহিত্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করে। লোক সাহিত্যের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ি আধুনিক সাহিত্য তার স্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব 'বিজু' উপলক্ষে স. ন. দেওয়ানের (সৌমেন্দ্র নারায়ন দেওয়ান)-এর সম্পাদনায় ***'বিজু'*** নামে প্রথম সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল। অবশ্য একই বৎসর অর্থাৎ ১ বৈশাখ ১৩৭৯ বাংলা তারিখে মুড়াল্যা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র ব্যানারে দীবঙ্গর শিরিগ্যান (দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা)-এর সম্পাদনায় ***'লুরা'*** নামে আরো একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। ইতোপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এ জাতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়নি। ***'বিজু'*** এবং ***'লুরা'*** সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পর সংকলন প্রকাশে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই, বিজু উৎসবকে উপলক্ষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অনেক সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তের জন্য ***'জুভাপ্রদ'*** এবং ***'মুড়াল্যা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'*** ইতিহাস হয়ে থাকবে। এ কথা সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যের ইতিহাস বা এ বিষয়ে কিছু তথ্য পেতে হলে ছোট ছোট সংকলন বা লিটন ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যেতে হবে। পাহাড়িদের সাহিত্য

চর্চাও অনেকখানি সংকলন বা লিটন ম্যাগাজিনকে নির্ভর করে এগিয়েছে যা এখনো যাচ্ছে বলা যায়। সুতরাং এসকল সাহিত্যেগুলোর মানের দিক বিচার না করে চর্চাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। পাহাড়ি জাতি হিসেবে তাদের বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা করা দুরূহ হলেও এ যাবতকালে যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা একেবারে ফেলনা নয়।

রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হলে সুগত চাকমাও সেখানে যোগদান করেন এবং তাদের জুভাপ্রদ সংগঠনের অধিকাংশ লোক বিভিন্ন চাকরিতে যোগদান করায় জুভাপ্রদ নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। তবে জুভাপ্রদের গড়া ভিত্তি ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্ররা সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়ে পড়ে। যেমন-জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন করা হয় ***'মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ'***, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ***'হিল্লো লিটারেচার গ্রুপ'*** ইত্যাদি। ***মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ*** '১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ***'কজলি'***, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ***'বিজু'*** এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ***'BIZU'*** নামে সংকলন প্রকাশ করে। অন্যদিকে ***হিল্লো লিটারেচার গ্রুপ*** ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ***'সত্রং'***, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ***'BIJUFUL'*** নামে সংকলন প্রকাশ করে। এসকল সংকলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ পায়। বিক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে আধুনিক সাহিত্যের গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যারা এসকল কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়েছিলেন তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য জগতে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ তাঁদেরকেই অনুসরণ করে পাহাড়ি সাহিত্য উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে সুহৃদ চাকমার অনেক অবদান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাহাড়ি ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারী এ ব্যক্তিকে নিয়ে লালন চাকমা নামে এক প্রবন্ধকার লিখেন ''.....***চাকমা সাহিত্যের মারাত্মক অনটন ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে সুহৃদ চাকমা একজন ঋণহীন চিত্তবান, যিনি আলোর দিক থেকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন তার সীমান্ত। এক আধা উর্বর মাটিতে তিনি স্বল্পায়ু নিরোগবৃক্ষ।''(BIZU FUL***, হিলেস্না লিটারেচার গ্রম্নপ, জা.বি. ১৩ এপ্রিল ১৯৮৩) প্রবন্ধকারের সন্দেহ ঠিক ছিল বলে মনে হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট তারিখে তাকে আলোর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এ সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পাহাড়িদের মধ্যে একজন উদীয়মান সাহিত্যিকের করব রচিত হয়। তিনিও পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত নাম। বাংলা ও চাকমা উভয় ভাষাতেই তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। ***বার্গী*** নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। এতে কবির ২২টি চাকমা কবিতা ছাপা হয়। কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদও দেয়া হয়েছিল। কবিতা ছাড়াও তিনি ছোটগল্প লিখতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রথম কবিতাগ্রন্থ ছাপা হয়েছিল ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। এ কৃতিত্বের অধিকারী হলেন সুগত চাকমা। তিনি ননাধন নামেও ব্যাপক পরিচিত। তিনি ঐ বৎসর **ননাধন চাকমা** নামে ***'রাঙামাত্যা'*** নামক কবিতা সংকলন ছাপিয়েছিলেন। এখানে উলেস্নখ

করা প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান অসীম। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এ ব্যক্তিটির পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও বাংলা সাহিত্যে অফুরন্ত অবদান রয়েছে। আজ পথে ঘাটে যে সকল জনপ্রিয় চাকমা গান শুনতে পাওয়া যায় সেগুলোর অধিকাংশ স্রষ্টা হলেন তিনি। তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্যের দিকপাল হিসেবেও গণ্য করা যায়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ***জুভাপ্রদ*** তাঁর দ্বিতীয় কবিতা সংকলন ***'রঙধঙ'*** প্রকাশ করেছিল। সম্ভবত এটিই জুভাপ্রদের শেষ প্রকাশিত বই। দীর্ঘ প্রায় ৭ বৎসর ধরে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে জুভাপ্রদের পথ চলাও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এসে থামে। প্রসঙ্গত উলেস্নখ্য যে, ননাধন চাকমা'র (সুগত চাকমা) ***'রাঙামাত্য'*** ও ***'রঙধঙ'*** কে আকারে ছোট হওয়ায় ঠিক কাব্যগ্রন্থও বলা যায় না। তবে এগুলো যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ এ গ্রন্থগুলো প্রকাশের পূর্বে এ ধরনের বই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়নি। ***রাঙামাত্য*** কবিতা গ্রন্থে মুদ্রিত ১২টি কবিতা-ই চাকমা কবিতা। অপরদিকে ***রঙধঙ*** গ্রন্থে ২৩টি ছোট-বড় চাকমা কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে ***'ধনপুদি-ধনপাদা'*** শীর্ষক কবিতায় কবি নিজেকে রোমান্টিকতায় উজাড় করে দিয়েছেন। কল্পনার সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। চাকমাদের ঐহিত্যবাহী ***'ঘিলা খেলা'য়*** পিনন পরা একজন চাকমা সুন্দরী যুবতীকে অবলোকন করেছেন এভাবে-

ধেগঙর পরানী-
বুইয়ারত উরে তর চুলানি
উরে তর পিনোনান ;
দেঘা যায় ধ্বল পহ্র ঝিমিলায়
রান' ছেরে এ মাধায় সে মাধায়,
সিত্তুন আ-র বেচ্ ঝিমিলায়
ত' চোগর হ্াঝিয়ান।
অর্থাৎ
দেখছি পরানী
ওড়ে তোর চুল বাতাসে
ওড়ে তোর পিননটা ;
দেখা যায় সাদা রশ্মি ঝিলিক মারে
দু'পায়ের মাঝখানে এদিকে ওদিকে
তার চেয়েও বেশি ঝিলিক মারে
তোর চোখের হাসিটা।

সুগত চাকমা বাংলা এবং চাকমা উভয় ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। এলাকা হিসেবে হয়তোবা তাঁর বাংলা সাহিত্য কর্মের চেয়ে পাহাড়ি সাহিত্য কর্মগুলো বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

তবে আধুনিক চাকমা গানেই তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি। যেমন-পাহাড়ি রমণীকে নিয়ে কবিতায় তাঁর যে ভাব-প্রবণতা, কল্পনা আমরা একটু আগেও লক্ষ্য করলাম ঠিক গানেও তীক্ষ্ণ ভাবাবেগ আমরা দখতে পাই। পাহাড়ি রমণীকে নিয়ে তাঁর কল্পনা-

জুম্মবী কমলে হ্াদিবে ম' ধাগত
কমলে ত' গাঙান মিজিব ম' গাঙত ॥
কোনোদিন দ্বিজনে হ্াদি যেই বিজনে
গা-ঝ ছাবাত বোই,
দিন্নবুয়া কাদেবং চোগে চোগে রিনি চেই
বানা কধা কোই।
ছারি দিনে ত' চুলান-
পোরি রবে ম' বুগত ॥
কোনোদিন দ্বিজনে এ দেজত বানিবং
আমি ঘর,
সারা রেইত যদি ঝরে আগাঝর
জু-ন পহ্র।
সাগরর কোচপানা লোইনে তুই থিয়েবে
মুজুঙত ॥
অর্থাৎ
জুম্মবী কবে হাঁটবে আমার পাশে পাশে
কবে তোমার নদী মিশবে আমার নদীতে ॥
কবে দু'জনে হেঁটে যাবো বিজনে
গাছের ছায়ায় বসে,
চোখে চোখে চোখ রেখে সারাদিন কাটাবো
শুধু কথা বলে।
খোঁপা খুলে চুল ছেড়ে
শুয়ে রবে আমার বুকে ॥
কবে দু'জনে এ দেশে বানাবো
আমরা ঘর,
সারা রাত্রি যদি ঝরে পরে আকাশের
চন্দ্রিমালো।
সাগরের মত বিশাল ভালবাসা নিয়ে তুমি দাঁড়াবে
আমার সামনে ॥

প্রসঙ্গত উলেস্নখ্য যে, লোকসাহিত্যের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পাহাড়ি আধুনিক সাহিত্যকে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছিল। ষাট দশকে যখন পাহাড়িদের মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের

বিকাশ পুরোদমে শুরূ হয় তখন পাহাড়ি সমাজ সেগুলোকে সহজে গ্রহণ করতে চায়নি। বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও প্রবন্ধকার সলিল রায় আধুনিক গান লিখে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন ***" অধুনা বেতার শিল্পী শ্রী সুরেন ত্রিপুরার নিজস্ব সুর যোজনায় যখন রাঙ্গামাটি কলা পরিষদের অনুষ্ঠানে আমার এ ধরনের ক'টি গান প্রথম গীত হলে সেদিন সুধী মহলের তরফ হতে সরূপ এবং বিরূপ উভয় সমালোচনাই আমাকে শুনতে হয়েছে। বিপক্ষ দলের যুক্তি ছিল এই-চাকমা সমাজে প্রচলিত উবাগীতের ঐতিহ্যকে আমি নষ্ট করতে চলেছি।"*** এটি শুধু চাকমা সমাজের বেলায় ছিল তা নয়। কিন্তু যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্য বিকাশ হতে থাকে এবং তার স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে লোকসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ পাহাড়ি লোকসঙ্গীতগুলো আজ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। লুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি যদিও সুখকর নয়। পাহাড়িদের মধ্যে এ লোকসাহিত্য চর্চাকারী এখন শুধুমাত্র গেংখুলি নামক চারণ কবিগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে চাকমা রাজবাড়ি। একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, রাজপরিবারের সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষত গৈরিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্য চর্চার পথ উন্মোচিত হয়েছিল। অরূন্ণ রায়, সলিল রায়, কোকনদাক্ষ রায়, বিনীতা রায় প্রমুখরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্যের জগতে এক অনন্য নাম। তবে তাঁদের মধ্যে কোকনদাক্ষ রায় ছিলেন অন্য ধরনের সাহিত্যিক। তিনিই সম্ভবত পাহাড়িদের মধ্যে প্রথম ছোটগল্প লেখক। তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছোটগল্পের জনক বলা যেতে পারে। তবে তিনি বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর অনেক ছোটগল্প ও নাটিকা গৈরিকা ও মাসিক পার্বত্য বাণী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য অরূন্ণ রায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কবি খ্যাতি পাওয়া একমাত্র কবি। তাঁর নামে বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। কিন্তু জীবিত কালীন সময়ে তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ***'ঝরাপাতা'*** নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থে কবির ৫২টি কবিতা ও ১টি দীর্ঘ গীতিকাব্য ছাপা হয়। কবি অরূন্ণ রায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। কবি তাঁর ***' হে নূতন জাগো '*** কবিতায় লিখেছেন-

হে নূতন জাগো, জাগো, খুঁজে নাও তোমার আসন
প্রতি পদে বাঁধা পূর্ণ প্রাচীরের সহস্র শাসন
সনম্র উপেক্ষা ভরে সম্মুখের লক্ষ্য পানে হও অগ্রসর
শক্তিতে বিশ্বাস রাখি আপনাতে করিয়া নির্ভর,
এ জীবনে জীর্ণ আর পরিত্যাজ্য যাহা কিছু আছে
সবি লুপ্ত হোক আজি দৃপ্ত তব সে শক্তির কাছে,
নবরূপে উজ্জীবিত নবীনের কল্যাণ পরশে
হাসিয়া উঠুক বিশ্ব উচ্চকিত নবীন হরষে।

আধুনিক পাহাড়ি সাহিত্য তার নিজস্ব স্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও এখনো পরিপূর্ণতা লাভ করেনি এ কথা নির্ধিদায় বলা যায়। এজন্য এ নিয়ে তেমন কোন আলোচনাও হয়ে ওঠে না। মোট কথা যে, আধুনিক সঙ্গীত ব্যতিত বিশেষ কোন সাহিত্য যেমন-কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি জাতীয় কোন সাহিত্য প্রশংসা পায়নি। তবে পাহাড়িদের মধ্যে ৭০-এর দশকে রচিত ফেলাজেয়্যা চাকমা'র ***'জুম্মবী পরানী মর'*** কবিতাটি পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি সাহিত্যিকদের বেশ নজর কাড়ে। বলা হয় যে, এ কবিতাটি এখনো অপ্রতিদ্বন্ধী। এ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় জুভাপ্রদের ***' বার্গী '*** সংকলনে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। সুগত চাকমা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ***" মূল কবিতায় প্রায় ৭০টি লাইন ছিল। কিন্তু এটির প্রথম প্রকাশে অর্থাভাবে মাত্র ৩৫টি লাইন প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীকালে প্রকাশের জন্য বাকী ৩৫টি লাইন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং মূল রচনা পত্রটি হারিয়ে যাওয়ায় কবির পক্ষেও নূতন করে বাকী লাইনগুলি রচনা করা সম্ভব হয়নি। তা' সত্ত্বেও প্রথম প্রকাশিত ৩৫টি লাইনের কবিতাটিকে খন্ডিত না বলে স্বয়ং সম্পূর্ণই বলা যায়। "*** সুগত চাকমা এ কবিতাটিকে ইংরেজি বিষাদময় গীতিকবিতা ***'ওড' (Ode)*** -এর আঙ্গিকে লেখা বলে উলেস্নখ করেছেন। মূলত এ কবিতায় পাহাড়িদের জুমিয়া জীবনের ব্যথা, বেদনা, হাসি-কান্না, বিরহ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন-

সাগরর পানি তর চোগ' ভর
এব' যে এধক অগে
ন-অদ' জানং মুই
অর্থাৎ
সাগরের এত জল তব চোখে
এখনও এত যে আছে
হায় আমি তা জানি না।

সুগত চাকমা লিখেছেন,***'Keats-এর Ode to Autumn-এ যেভাবে হেমন্ত দিনের সৌন্দর্য এবং হারানোর বেদনা উপস্থিত তেমনি 'জুম্মবী পরানী মর' কবিতায় ও ৩য় স্তবকে এসে হারিয়ে যাওয়া জুম জীবনের সৌন্দর্য উপস্থিত হয়েছে–***

আঘেনি ঈদৎ তর, মোনঘর, জুন' পহ্র
বাঝীলই, সিঙালই, ধুধুগ' র ?
আঘেনি ঈদৎ তর কুজিকুজি মনকানানি
খেংগরঙ' র ?
আঘেনি ঈদৎ তর মোনমাধা থুম' ইধু কবরগ' জুম
কাদ্যায় বাচ্চ্যে থেই সাঙু কিত্যা চেই চেই-
এলনি সেক্কে তর দি-চোগত ঘুম ?
অর্থাৎ
পড়ে কি মনে মোনঘর, চাঁদনী রাত,
বাঁশী, শিঙা আর ধুধুগের সুর ?

পড়ে কি মনে মন মাতানো খেংগ্রাঙের সুমধুর সুর ?
পড়ে কি মনে পাহাড়ের মাথায় কবরগ-এর জুম ?
কার আগমনের প্রত্যাশায় মইয়ের উপর তুমি,
ছিল কি তখন দু'চোখে তোমার ঘুম ?

ফেলাজেয়্যা চাকমা'র **'জুম্মবী পরানী মর'** কবিতাটির ন্যায় কবিতা চাকমা'র 'জ্বলি ন উধিম কিত্তেই' (রন্নখে দাঁড়াব না কেন!) কবিতাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। কবিতাটি প্রতিবাদী কবিতা। কবিতা চাকমা'র ***'জ্বলি ন উধিম কিত্তেই'*** নামক একটি চাকমা কাব্যগ্রন্থও ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নীররে যে ব্যক্তিটি সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছেন তিনি হলেন মৃত্তিকা চাকমা। তিনি মূলত চাকমা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন। ইতোমধ্যে তাঁর ৩টি কাব্যগ্রন্থ ছাপা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ***'মন পরানী'(২০০২খ্রিঃ)***, ***'দিকবন সেরেত্তুন '(১৯৯৫খ্রিঃ)***, এবং ***'এখনো পাহাড় কাঁধে'(২০০২খ্রিঃ)***। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থটি ছাড়া অপর দু'টি চাকমা ভাষায় রচিত। চাকমা ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর প্রায় সব কবিতা এবং অন্যান্য রচনাবলী চাকমা ভাষাতেই করে থাকেন। এটিই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃত্তিকা চাকমা নাট্যকার হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর রচিত ১১ টি চাকমা নাটক ঢাকা, রাঙ্গামাটিসহ পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মঞ্চস্থ হয়েছে। এসবের মধ্যে ***'এক জুর মান্নেক'*** ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ***'গোজেন'*** ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুস্তকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত অন্যতম একটি নাটক ***'দেবংসি আহ্‌দর কালা ছাবা'*** ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে সিডিতে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত তিনিই একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি যার রচিত এতগুলো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

আমরা পাহাড়িদের মধ্যে গান, কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প লেখার চর্চা হরহামেশা দেখলেও এখনো উপন্যাস লেখার প্রবণতা দেখি না। বিংশ শতাব্দীতে রাণী বিনীতা রায়ের রচিত ***'অকূলে'*** নামক একটি উপন্যাস গৈরিকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত তিনিই প্রথম উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

পূর্বে উলেস্নখ করেছি যে, পাহাড়িদের মধ্যে নিজস্ব মাতৃভাষা ও বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা হয়ে থাকে। বর্তমানে নিজেদের মধ্যে নিজস্ব মাতৃভাষাতে রচিত গান, কবিতা, ছড়া জনপ্রিয়তা হচ্ছে। অনেক সময় ভিন জাতীয় কোন লোককেও পাহাড়ি গান, কবিতা চর্চা করতে দেখা যায়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এ দেশের বরেণ্য শিল্পী মাহমুদুন্নবী নেপালে চিত্র মোহন চাকমা রচিত ***'আয় তুঙ্গুবি ম লঘে কাঙারা ধরা যেই, ছড়া পারত জুম লেঝাত লুরা লবং ধরেই'*** (আয় তুঙুবি আমার সাথে কাঁকড়া ধরতে যাই, ছড়া পাড়ে জুমের পাদদেশে আগুনের শিখা নেবো জ্বালাই) শীর্ষক চাকমা গানটি গেয়েছিলেন। বলা যায়, পাহাড়িদের ভাষার ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা। ইতোমধ্যে কম্পিউটারে নিজস্ব বর্ণের সফ্‌টওয়্যার তৈরি হওয়ায় সাহিত্যানুশীলনের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাসমূহ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত থাকছে। এক্ষেত্রে একুশে ফেব্রম্নয়ারি মন্ত্রদাতার ভূমিকা পালন করছে বলে আমার মনে হয়।

বিংশ শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকে পাহাড়িদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হয়ে আসছিল। কিন্তু সাধক শিব চরণ রচিত ***'গোজেন লামা'*** ছাড়া ঐ সকল সাহিত্য কর্ম ছাপার অক্ষরে কোনদিনও আলোর মুখ দেখেনি। যারা সাহিত্য চর্চায় নিমজ্জিত ছিলেন তাদের রচনা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে চাকমাদের মধ্যে শুধু নয়, পাহাড়িদের মধ্যে যারা তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন বারমাসী রচনা করেছিলেন সেগুলো লোক মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। যার কারণে মৌলিক রচনা থেকে বারমাসীগুলোর ভাষা ও শব্দে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে পাহাড়িদের মধ্যে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং এগুলো ছাপার অক্ষরে ছাপা হতে আরম্ভ করে। মোট কথা যে, বিংশ শতাব্দীতে পাহাড়ি সাহিত্য তার একটি মজবুত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এসকল সাহিত্য কর্মের মান হয়তো এখনো বিচারযোগ্যতায় নিজেকে তৈরি করতে পারেনি কিন্তু পিছিয়ে পড়া একটি জাতির জন্য এগুলো নিঃসন্দেহে বড় সম্পদ। এদিক বিচেনা করলে পাহাড়িদের সাহিত্য কর্মগুলোর মান কোন অংশে কম নয়। এছাড়া প্রচার না হওয়ার কারণে এগুলো আলোচনার বাইরে ছিল। ফলে অধিকাংশ মানুষ পাহাড়িদের সাহিত্য কর্ম আছে বলে অবহিত নয়। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া লিখেছেন, ***"পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়েছে বলে বলে আমাদের জানা নেই। ফলে এই অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।"*** বিপ্রদাশ বড়ুয়ার বক্তব্য আংশিক সত্য বলে মেনে নেয়া যায়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে এযাবৎকালে প্রচুর সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সংকলন ছাড়াও বিশেষভাবে গান, ছড়া ও কবিতার সংকলন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন-জুভাপ্রদ কর্তৃক ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সাইক্লোস্টাইল করা রঞ্জিত দেওয়ান ও ঝর্ণা চাকমা সম্পাদিত ১৬ পৃষ্ঠার গানের সংকলন ***'চাকমা গান'***, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ***'রাঞ্জুনী'***, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুহৃদ চাকমা সম্পাদিত চাকমা গানের সংকলন ***'ছদক'***, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সুগত চাকমা সম্পাদিত চাকমা গানের সংকলন ***'হাওঝর চাঙমা গান'*** ও সুহৃদ চাকমা সম্পাদিত চাকমা কবিতা সংকলন ***'গেংখুলী'***, সুগত চাকমা সম্পাদিত চাকমা গানের সংকলন ***'চাকমা গান' 'চিজির গান'*** ও ***'রঙ্‌গীদ'***, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সুগত চাকমা ও দেবী প্রসাদ দেওয়ান সম্পাদিত চাকমা গানের সংকলন ***'চাঙমা গান'***, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুগত চাকমা সম্পাদিত চাকমা কবিতা সংকলন ***'রংধং'***, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী প্রকাশিত বিনয় শংকর চাকমা সম্পাদিত পাহাড়ি গানের বই ***'শিঙা'***, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠী প্রকাশিত মানস মুকুর চাকমা সম্পাদিত চাকমা

ছড়ার সংকলন *'চাঙমা ছড়া'* , ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *'রিপরিপ'*, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাজা দেবাশীষ রায় ও রূপায়ন দেওয়ান সম্পাদিত চাকমা গানের সংকলন *'হুয়াং ছেরে চাকমা গীত'*, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সুসময় চাকমা সম্পাদিত মুড়াল্যা লিটারেচার গ্রুপ প্রকাশিত চাকমা কবিতা সংকলন *'রেঙ'*, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাঙামাটি ঈসথেটিক্স কাউন্সিল প্রকাশিত বীর কুমার চাকমা সম্পাদিত চাকমা কবিতা সংকলন *'পাত্তলী'*, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জুস ঈসথেটিক্স কাউন্সিল প্রকাশিত চাকমা ছড়া বিষয়ক সংকলন *'কজ'ফুল'*, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চাকমা কবিতা সংকলন *'কজমা পাদা'*, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তরুণ কুমার চাকমা রচিত চাকমা গানের বই *'বাজী র'* ইত্যাদি গান, ছড়া ও কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রচার থাকায় সেগুলো বাংলাভাষী পাঠকদের সকাশে পৌঁছেনি। এমনটি পাহাড়িদের মধ্যেও এসকল সংকলন গুলোর কথা কতজন বা অবগত আছেন। আমি মনে করি পাহাড়িদের সাহিত্য কর্মকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। এতে করে বাংলাভাষীসহ অন্যান্য ভাষার পাঠকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে এগুলো আলোচনায় উঠে আসবে এবং তাতে প্রতিনিয়ত মানের দিকে অগ্রসর হবে এমনকি ভুল-ভ্রান্তি শোধরানোরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পূর্বেই উলেস্নখ করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সাহিত্য কর্মকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১. পাহাড়িদের নিজস্ব মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা এবং ২. বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা। আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীতে উপরোক্ত দু'টি ভাগে পাহাড়িদের সাহিত্য কর্মগুলো সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যা বিচারে হয়তো বা বাংলাভাষায় সাহিত্য কর্মের সংখ্যার পরিমাণ বেশি হবে। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিগত দু' শত বৎসরেও অধিক সময় ধরে বাংলা চর্চা হয়ে আসছিল। ফলে সুদীর্ঘকাল নৈকট্যের কারণে পাহাড়িরা সহজে বাংলাভাষাকে আয়ত্ব করে থাকে। নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করলেও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পূর্বে চাকমা ও মারমা হরফের পাশাপাশি বাংলা হরফও পাহাড়িরা ব্যবহার করতো। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার বিপরীতে চাকমা হরফকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালে চাকমা হরফের মুদ্রণ যন্ত্র না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চাকমা হরফে কোন পুস্ত্মক প্রকাশিত হয়নি। হরফ তৈরি করে পুস্ত্মক ছাপানো শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পাহাড়ি জাতির জন্য ছিল কল্পনা প্রসুত ব্যাপার। যার কারণে আমরা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে নিজস্ব হরফে কোন মুদ্রিত বই দেখতে পাইনা। কিন্তু অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে থাকা বৃটিশদের পক্ষে উলেস্নখিত সমস্যাটি ছিল একেবারে নগণ্য। যার কারণে তারা ভারতের এলাহাবাদ থেকে চাকমাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে চাকমা হরফে চাকমা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিল।

সাহিত্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। আর সাহিত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র কিংবা মুদ্রিত বই, সংকলন ইত্যাদি। এসব

না থাকলে যতই সাহিত্য কর্ম মনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হোক না কেন তা প্রকাশ করা না গেলে সাহিত্যে রূপান্ত্মরিত হয় না। পাহাড়িদের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম সত্য একটি ব্যাপার। দেখা গেছে অতীতে অনেক সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি তার মনের খোড়াক মেটানোর জন্য নীরবে ঘরে বসে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ভরে কবিতা, গান, ছড়া, ছোটগল্প এবং নানা ধরনের বারমাসী রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো রচনাকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অতিশয় দুর্গম থাকা, আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকা সর্বোপুরি সচেতনতা না থাকায় ঢাকা কিংবা কলকাতায় গিয়ে বই মুদ্রণ করে নিয়ে আসা পাহাড়িদের জন্য ছিল দুষ্কর। এছাড়া পাঠক সংকট তো ছিলই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে উলেস্নখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ অনেক পরিমাণে দূরীভুত হওয়ায় আমরা মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত্ম পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কয়েকজন লেখকের রচিত ও মুদ্রত বই দেখতে পাই। এজন্য আলোচ্য প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীকে পাহাড়ি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বলা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

বাংলা

১. *চাকমা জাতি* , সতীশ চন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, ১৯০৯ খ্রিঃ।
২. পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যিক, নন্দ লাল শর্মা, ১৯৮৩ খ্রিঃ।
৩. চম্পকনগর সন্ধানেঃ বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি, সুপ্রিয় তালুকদার, উ.সা.ই.রাঙ্গামাটি,১৯৯৯ খ্রিঃ
৪.বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য, সুগত চাকমা, উ.সা.ই. রাঙ্গামাটি, ২০০২ খ্রিঃ।
৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদক-বিপ্রদাশ বড়ুয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩ খ্রিঃ।
৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত কবিতা, উ.সা.ই. রাঙ্গামাটি ২০০৮ খ্রিঃ

ইংরেজি

1. Chittagong Hill Tracts by R.H. Sneyd Hutchinson, 1909.(Reprint 1978, India)
2. Bengal District Gazetteer, B. Volume, Chittagong Hill Tracts District, 1933, Calcutta.

সংকলন

১. BIZU, EDITOR-SUSAMOY CHAKMA, MURALLYA LITERATURE GROUP, JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY, 13 APRIL 1981.
২.ইরন্নক, বিজু সংকলন ১৩৮৯, দীপেন দেওয়ান ও কৃষ্ণ চাকমা সম্পাদিত, রাঙ্গামাটি ঈসথেটিক্স কাউন্সিল।

প্রবন্ধ

১. চাকমা রাজপরিবারে লেখনি চর্চা, শুভ্র জ্যোতি চাকমা, স্থানীয় ইতিহাস, সম্পাদক ড. মোঃ আবুল কাশেম, হেরিটেজ আর্কাইভস অব বাংলাদেশ হিসট্রি ট্রাস্ট, রাজশাহী, ২০০৮ খ্রিঃ।
২. সমকালীন চাকমা কবিতার রূপরেখা, বিজু, সম্পাদক-সুসময় চাকমা, মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১ খ্রিঃ।
৩. দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার চাকমা কবিতা ঃ ভাব ও আঙ্গিক বিশেস্নষণ, সুহৃদ চাকমা, ইরস্নক, সম্পাদক-দীপেন দেওয়ান ও কৃষ্ণ চাকমা, রাঙ্গামাটি ঈসথেটিক্স কাউন্সিল, ১৩৭৯ বাংলা।
৪. কবিতা সমালোচনা (জুম্মবী পরাণী মর), সুগত চাকমা(ননাধন), জুম প্রকাশনা, সম্পাদক-অনুপম চাকমা, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ খ্রিঃ।
৫. চাকমা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, নন্দ লাল শর্মা, গিরিনির্ঝর, জুন সংখ্যা, উ.সা.ই. রাঙ্গামাটি, ১৯৮৮ খ্রিঃ।

.....

শুভ্র জ্যোতি চাকমা, রিসার্চ অফিসার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

শ্রী প্রগতি খীসা

প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান

স্মরণাতীত কাল হতে চট্টগ্রামও ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম চাকমা রাজ্য। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বহু পূর্বে মোঘল, নবাবী আমল এবং কি তৎপূর্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাজাগণ স্বাধীন ছিলেন। তাই চাকমাগণ বাইরের কোন হস্ত্মক্ষেপ ছাড়াই চট্টগ্রাম ও পার্বত্যাঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করেছিলেন। বাংলার সর্বশেষ নবাব সিরাজউদ্দোলা স্বীয় সেনাপতিদের ষড়যন্ত্রে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলে তৎকালীন বিহার, বাংলা ও উরিষ্যা বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে চলে যায়। এবং ১৭৬০ সালের ১৫ই অক্টোবর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে যখন পূর্বদিকে তাদের শাসন বিস্ত্মার করা শুরম্ন করে তখন চাকমা রাজাগণ বৃটিশদের বিরম্নদ্ধে রম্নখে দাঁড়ায়। সে সময় দক্ষিণে কর্ণফুলির অববাহিকায় শুলক বহর ও শিকল এবং উত্তর পূর্বদিকে হালদা নদী বিধোত সমভূমি এলাকাসহ সমগ্র রাংগুনিয়া অঞ্চল তথা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল চাকমা রাজার স্বাধীন সার্বভৌম আবাস ভূমি। চাকমা রাজ্যের বিস্ত্মৃত সীমানা খর্ব করার হীন উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে সমগ্র রাংগুনিয়া অঞ্চল বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একতরফাভাবে চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করলে চাকমা রাজা শের দৌলত খাঁ ও কোম্পানীর মধ্যে সংঘাত শুরম্ন হয়। এই সংঘাত শের দৌলত খাঁর পুত্র রাজা জান বাক্স খাঁর শাসনামল পর্যন্ত চলেছিল। পরে ১৭৮৭ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিং এর সহিত চাকমা রাজা

জানবক্স খাঁর মধ্যে সমঝোতার চুক্তি সম্পাদিত হলে সেই সংঘাত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। রাজা জানবক্স খাঁ ও গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিং এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তি গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিং এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তি গভর্নর জেনারেলের শাসন কাউন্সিল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে আবারো সংঘর্ষ শুরম্ন হয়ে যায়। ব্রিটিশ রাজ শক্তির কাছে রাজার প্রতিরোধ শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষাপটে রাজা জান বাক্স খাঁর পুত্র টব্বর খাঁর অকাল মৃত্যুর পর তারই অনুজ রাজা জব্বর খাঁ বাধ্য হয়ে ১৭৯৮-৯৯ ইং সালে কলিকাতায় গিয়ে কোম্পানীর সহিত সমঝোতা চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হন । এই চুক্তির ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে চট্টগ্রমে- পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটি রাজ্যকরদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং কোম্পানীকে বার্ষিক ৫০১মন কার্পাস কর হিসেবে প্রদান করার বিনিময়ে কোম্পানি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চাকমা রাজার রাজ্যের অভ্যন্ত্মরীন প্রশাসনে কোন রূপ হস্ত্মক্ষেপ না করার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সম্পাদিত চুক্তি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপস্নবের বিদ্রোহ পর্যন্ত্ম বলবৎ ছিল। তাই চাকমা রাজাগন ১৮৬০ সাল অবধি স্বাধীনভাবে তাদের রাজ শাসন কার্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৮৬০ সাল বৃটিশ শাসনাধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বর্হিভূত অঞ্চল হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করা হয় । তৎকালীন জেলার প্রশাসন কেন্দ্রের চন্দ্রঘোনা হতে রাঙ্গামাটি আনা হয় এবং একই সাথে চাকমা রাজার রাজ বাড়ি রাজানগর হতে রাঙ্গামাটি স্থানান্ত্মরিত হয়। শাসন বর্হিভূত অঞ্চল হিসেবে তখন পর্যন্ত্ম পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিবাসী রাজাদের স্বশাসন ব্যবস্থা বজায় ছিল । কিন্তু সুচতুর বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্ব প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টিন টি, এইচ, লুইন , ১৯৬৭ সালের এতদ অঞ্চলের রাজাদের মর্যাদা ও রাজস্ব পরিমান নির্ধারনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তারাঞ্চলকে নিয়ে আরও একটি নতুন সার্কেল সৃষ্টি করার বৃটিশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্ত্মাব পেশ করেন । ফলে ১৮৭৩ সালে এই প্রস্ত্মাব গৃহীত হলে মং সার্কেল গঠিত হয় এবং রাজা পদটি অপলোপন করে সার্কেল চীফ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় । এভাবে সুগভীর কূটকৌল আশ্রয় গ্রহণ করে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের রাজাদের স্ব -শাসন ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর করা হয়। বৃটিশ সরকার The Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 শাসন ব্যবস্থা জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে “উপজাতীয় অধ্যুষিত ও পশ্চদপদ অঞ্চল ” হিসেবে নতুন শাসন বিধি প্রবর্তন করলেও এই ১৯০০ আইনবিধি ছিল উপজাতীয়দের জন্য স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টি সংস্কৃতির রক্ষাকবচ। এই শাসন ব্যবস্থা পাকিস্ত্মান সৃষ্টির অবধি পর্যন্ত্ম বলবৎ ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের পর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিক্তিতে ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্ত্মান নামক দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনসাধারণ ৯৯% জন অমুসলিম উপজাতীয় আদিবাসী হলেও অজ্ঞাত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্ত্মানে অন্ত্মর্ভুক্ত করা হয় । তবে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্ত্মানের সহিত অন্ত্মর্ভুক্ত হবার কোন কারণ ছিলো না । পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী ভূমিজ সন্ত্মান আদিবাসীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা রহস্যজনক কারণে জোরজবরদস্তি ও অন্ত্মর্ভূক্তি করা হয় । পাকিস্ত্মানের শাসনব্যবস্থার প্রথম সংবিধানে ১৯৫৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে “শাসন বহির্ভূত

এলাকা" হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সংবিধানে শাসন বহির্ভূত এলাকার পরিবর্তে "উপজাতীয় এলাকা " হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় । এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় আদিবাসীদের ভূমি অধিকার হরণ করার সুগভীর ষড়যন্ত্র শুরূ হয়। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিগ্রহণ প্রবিধান জারী করে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে কৃষি নির্ভর উপজাতীয়দের ৫৪ হাজার একর চাষাবাদযোগ্য ধান্যজমি চিরতরে কৃত্রিম নদীর পানিতে তলিয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ আদিবাসী নিজ বাস্তুভিটা হারিয়ে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয় এবং ৬০ হাজারের অধিক আদিবাসী পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরূণাচল প্রদেশে দেশান্তরী হয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিক্তির অবকাঠামো অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ভেঙ্গে পড়ে । শুধু তাই নয় ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বিধির ৫১ নং বিধি বাতিল ঘোষণা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সবার জন্য বসবাসের ও প্রবেশের উন্মুক্তাঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে বারবার পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯০০ শাসন বিধি, উপ-বিধি সংশোধন করে আদিবাসীদের স্বার্থের চরমভাবে আঘাত হানা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে পড়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা।

হীন বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের এসব হীন ষড়যন্ত্র ও উপজাতীয় স্বার্থের নগ্ন হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোন দিন চুপ করে বসে থাকেনি। তারা দুই সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করার জনমত গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়ে পড়েন । যেমন- পাহাড়ী জাতিসত্ত্বা সমূহের শিক্ষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং বিলুপ্ত প্রায় ঐতিহ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে তৎকালীন প্রভাবশালী আদিবাসী নেতা শ্রী রাজ মোহন দেওয়ানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯১৫ সালে "চাকমা যুবক সমিতি " নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম জন-সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এর পরবতীতে শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে চাকমা যুবক সংঘ এবং প্রখ্যাত রাজনৈতিক সাবেক এম.এল.এ শ্রী কামিনী মোহন দেওয়ান ১৯২০ সালে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জন সমিতি। এই পার্বত্য জন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন সেই সময়ের তুখোর ছাত্রনেতা শ্রী স্নেহ কুমার চাকমা ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলা হয় এবং এক পর্যায়ে শ্রী স্নেহ কুমার চাক্মার নেতৃত্বে ছাত্র জনতা এক মহা সমাবেশ গঠিয়ে তৎকালীন ডি,সি সাহেবের বাংলোর বৃটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, এ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি ছিল রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী এবং আদিবাসীদের জলাঞ্জলিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার স্বপ্নে বিভোর। তাছাড়াও চাকমা রাজ পরিবারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎ চন্দ্র তালুকদার ও শ্রী সুনীতি চাকমার নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে গঠন করা হয় আর এক ছত্র সংগঠন "পার্বত্য চট্রগ্রাম ছাত্র সমিতি" পার্বত্য চট্রগ্রাম ছাত্র

সমিতি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক দাবী-দাবা আদায়ের লক্ষে গঠিত হলেও মূলতঃ এই সংগঠনটি ছিল সামন্ত শাসন ও আদিবাসীদের উপর শাসন-শোষন বজায় রাখার কুট-কৌশলে ব্যবহার করার দাবার গুটির মত। এভাবে বৃটিশ শাসনামলে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ীদের ভাগ্যোন্নয়নে কোন কাজই করতে পারেননি। অধিকন্তু স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র একদিনের মাথায় অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে শ্রী স্নেহ কুমার চাকমার অপরিনামদর্শী নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডি,সি বাংলোয় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের চোখে সন্দেহের বীজ বপন করা হয়। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা পাকিস্তান সরকারের কাছে ছিলেন বরাবরই সন্দেহের চোখে নিবদ্ধ এবং সৎ মায়ের কাছে সতীনের ছেলের মত। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত আদিবাসী পাহাড়ীদের সাংগঠনিকভাবে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। এমনকি, সে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কোন ভোটাধিকার পর্যন্ত ছিল না। একটি সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও যেখানে ভোটাধিকার পর্যন্ত ছিল না সেখানে নাগরিক মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি আশা করা ভাতুলতা মাত্র। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের অভিপ্রায় মূলতঃ রাজনৈতিক চেতনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ সুপারের অনুমতিক্রমে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে শ্রী কামানী মোহন দেওয়ান গঠন করেন "Hill Tracts People's organization" সংগঠন গড়ে তোলা হলেও সংগঠনের কর্ম পরিধি পরিলক্ষিত না হওয়ার তৎকালীন ডাক সাইটে ছাত্রনেতা শ্রী মৃণাল কান্তি চাকমা ও শ্রী অনন্ত বিহারী খীসার নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় " Hill Student councill" সংগঠনটি ছাত্র সংগঠন হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং সম্ভবও নয়। এদিকে পাহাড়ীদের ক্ষতি সাধনে পাকিস্তান সরকারও চুপ করে বসে থাকেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের ব্যাপক হারে ক্ষতি সাধন করার ফন্দি মাথায় এনে ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয় পাকিস্তান সরকার। এই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তাবায়নের ফলে আদিবাসীদের দুর্দশা সম্পর্কে কারোর অবিদিত নয়। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করতে গিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (মঞ্জু) ১৯৬০ সালে আইয়ুব সরকারের নিকট গ্রেফতার হয়। সম্ভবতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক কারণে বন্দিত্ব জীবন যাপন করেন। আর সেসময় অন্যান্য আদিবাসী নেতারা ছিলেন বিভোর ঘুমে ঘুমাচ্ছন্ন এবং তথা কথিত সমস্ত প্রভূরা ছিলেন সিংহাসন রক্ষায় মশগুল ও নিশ্চুপ। তথাপি পাকিস্তান সরকার সিংহাসন রক্ষা না করেই পাকিস্তানের সংবিধানে ১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করে দেয় এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ডুবে যায় অপূর্ব স্থাপত্য চাকমা রাজবাড়ী ও উদ্বাস্তু হয় লক্ষাধিক পাহাড়ী জনতা। এরপর পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি লাভের পর শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৬৫ সালে গঠন করেন "পাহাড়ী ছাত্র সমিতি"। মূলতঃ এই পাহাড়ী ছাত্র সমিতিই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূখ্য প্রাণ শক্তি।

পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সুদূর প্রসারী চিন্ত্মা চেতনার ফসল হিসেবে বর্তমান বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ শ্রী অনন্ত্ম বিহারী খীসাও বাংলাদেশী আদিবাসীদের প্রাণপুরন্নষ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি"। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতিটি পাকিস্ত্মান শাসকদলের বিরন্নদ্ধে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সহিত যুগপৎ গণ আন্দোলনে শরীক হয়ে ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের ডাক দেয়। তৎকালীন আইয়ুব খান সরকার আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে পার্বত্য চট্রগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দও বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও হয়রানীর শিকার হয়। এদিকে পার্বত্য চট্রগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও ধর্মীয় প্রচারের পাশাপাশি পার্বত্যাঞ্চলের আপামর জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। রাজগুরন্ন শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের বার্মায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৫৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি গঠন করেন। তিনি নিজেই সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার বাবা খ্যাতিমান শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সংগঠক শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় ভিক্ষু এবং একই সময়ে শ্রী বিজয় কেতন চাকমার (তখন ধর্মরত্ন শ্রামণ) নেতৃত্বে গঠন করা হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি"। এই দুই সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে উঠে দূর্বার গণযোগ এবং স্বজাতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নের প্রাণ স্পন্দন। এদিকে ৬ দফা আন্দোলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা গণ আন্দোলনে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা প্রাদেশিক সদস্য পরিষদ নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগ লাভ করে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্ত্মানের আইয়ুব সরকার আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে ২৫ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ।

অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে গঠিত হয়"গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার "।অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে শুরন্ন হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মরহম এইচ,টি ইমামের দূরভিসন্ধিতে চাকমা রাজা মেজর ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিতে বাধ্য হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের দামাল আদিবাসী ছাত্র যুব সমাজ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলার লাখো মানুষের শহীদের রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ ৯ মাস স্বশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্ত্মানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। শুরন্ন হয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পণয়ন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে,স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা অপরাপর অঞ্চলের আদিবাসীদের আত্ম পরিচয়ের কথা তথা বাংলার কোটি কোটি খেঁটে খাওয়া শ্রমিক ,জেলে, মাঝি মালা, কামার-কুমার, তাঁতী, মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বাংলাদেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি । এর প্রতিবাদে আইন পরিষদ সদস্য শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সদ্য রচিত সংবিধানে স্বাক্ষর না করে সংসদ হতে ওয়াক আউট করেন। একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জাতীয় অস্ত্মিত্ব স্বীকার করা হয়নি, অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দেরকে বাঙ্গালী আখ্যা

দিয়ে বাঙ্গালী হওয়ার পরামর্শ দেন, যা ছিল কাটা গায়ে নুন ঢেলে দেওয়ার মত। এরই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রয়োজনীয়তা অনুভবের ফসল হিসেবে ১৯৭২ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি"। সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন বর্ষীয়ান জননেতা শ্রী বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আইন পরিষদ সদস্য শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা । পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এই দুই দিক পালের সুযোগ্য নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষ সমর্থনে ১৯৭৩ সালের প্রথম গণ পরিষদে স্বতন্ত্ম প্রার্থী শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও শ্রী চাথোয়াই প্রন্ন রোয়াজা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মূলতঃ এই সংসদ সদস্য নির্বাচনই ছিল জন সংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর আদিবাসীদের স্বতঃস্ফুতঃ অকুণ্ঠ সমর্থন।এই কারণে পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাঁর রাজনৈতিক সর্মসূচী ঘোষণা পরিচালনা করতে গিয়ে আর কোন গণ মতামত নেয়ার অবকাশ ছিল না। এক কথায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হয়ে উঠে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত গণ মানুষের ভাগ্য বিধাতা অভিভাবক রাজনৈতিক সংগঠন। শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী আধিবাসীদের স্বকীয় অস্ত্মিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে পাহাড়ী জনগণ তাদের জাতীয় অস্ত্মিত্ব রক্ষায় সংকিত হয়ে পড়েন। ফলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকল্প হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে অধিকার আদায়ের কথা ভাবতে থাকেন। এই চিন্ত্মা চেতনার বর্হিপ্রকাশই ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৩ সালের সশস্ত্র শান্ত্মি বাহিনীর জন্ম। এদিকে বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আধিবাসীদের মর্মব্যথা উপলব্দি করতে সক্ষম না হলেও পরবর্তীতে আধিবাসী জনগণের রাজনৈতিক ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়াসী হন এবং বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের বহু দলীয় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা বন্ধ করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক সংগঠন বাকশাল শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে যোগদানে আহব্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা বাকশালে যোগদান করেন কিন্তু দেশী- বিদেশী ষঢ়যন্ত্রের কবলে পড়ে বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। এবং খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রীয় শাসনে আবির্ভূত হয়ে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা আত্মগোপনে চলে গিয়ে শুরন্ন করেন তুমুল সশস্ত্র আন্দোলন। শুরন্ন হয় পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বিভিষিকাময় নতুন কালো অধ্যায়। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সশস্ত্র উইং শান্ত্মি বাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধ সরকার ত্রমের কোনঠাসা হয়ে পড়ে। শান্ত্মি বাহিনী উপ-দলীয় কোন্দলে ক্ষমতার উচ্চ বিলাসী গিরি সশস্ত্র চক্রের হাতে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর এক চোরাগুপ্ত হামলায় শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিহত হন এবং তারই অনুজ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্ত্মিবাহিনী প্রতিষ্ঠাতা শ্রী

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সমিতির সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্ব পার্টির উপ-দলীয় কোন্দল সমূহ উৎখাত করে দূর্বার সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয় এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আগের চেয়ে দ্বিগুন শক্তিশালী হয়ে উঠে। একদিকে সশস্ত্র প্রতিরোধ অন্যদিকে পাবর্ত্য ভিক্ষু সংঘ ও অহিংসা ভিত্তিতে শান্তিস্থপূর্ণ সমাধানের জন্য দেশে বিদেশে প্রচারনা শুরন্ন করে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ছাত্র ও সুশীল সমাজ শুরন্ন করে ঐতিহাসিক গনতান্ত্রিক দূর্বার গণ আন্দোলন। ১৯৮৯ সালে লংগদু গনহত্যার প্রতিবাদে পাবর্ত্য ভিক্ষু সংঘই সর্বপ্রথম ঢাকায় ঐকিহাসিক শান্তিস্থ মৌন মিছিলের ডাক দেয়। এই মৌন মিছিলের সারা পাবর্ত্য চট্টগ্রাম প্রায় পাচঁশতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করে এবং তৎকালীন ভিক্ষু সংঘের সভাপতির শ্রীমৎ বিমল বংশ মহাথের এর নেতৃত্ব জাতিগত সংঘাত পরিহার করে শান্তিস্থপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যা সমাধানের দাবী জানিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। একই সময়ে গঠিত হয় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ। এই ছাত্র পরিষদ ও অভিন্ন দাবী জানিয়ে রাজপথে গণ আন্দোলন ডাক দেয়। সংগতঃ কারনে জেনারেল এরশাদ সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে শান্তিস্থপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের আলোকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দেকে বৈঠকে বসার আহব্বান জানান। সরকার ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে শুরন্ন হয় দীর্ঘ সংলাপ। এক পযায়ে সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে অন্যাভাবে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্রতী হয়। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ৯৯% জন গণমানুষের মতামত উপেক্ষা করে সমস্যা সমাধানের নামে ১৯৮৯ সালে গঠন করা হয় তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ। এই স্থানীয় সরকার পরিষদ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে জনসংহতি সমিতি আবারো তার পূর্বের আস্তানায় ফিরে যায়। কিন্তু বাংলার গণ মানুষের আন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হলে ১৯৯১ সালের সাধারন নির্বাচনে বি,এন,পি সরকার ক্ষমতায় আসে। বি,এন,পি সরকার ক্ষমতায় এসে আবারো পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ এর নেতৃত্বে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটি এবং বর্ষীয়ান জননেতা হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে গঠন করা হয় পাবৃত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটি। এর পর শুরন্ন হয় বি,এন,পি সরকারের সহিত জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক শান্তিস্থ সংলাপ বৈঠক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা হতে বিদায় নেয়। এরপর ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার চীফ হুইফ আবুল হাসনাত আব্দুলাকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটির নেতৃত্বে পুনরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহিত বৈধক অনুষ্ঠিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিস্থ চুক্তি। এই চুক্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন চীফ হুইফ

আবুল হাসনাত আব্দুলাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জনসংহতি সমিতির সুযোগ্য সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু)। ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিস্থ চুক্তি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয় এবং এই চুক্তি আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি হিসেবে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা লাভ করেন ইউনেস্কা শান্তিস্থ পুরস্কার।

এই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিস্থ চুক্তির আওতায় ১৫ই জুন ১৯৯৮ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং এই মন্ত্রণালয়ে খাগড়াছড়ি খেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তাছাড়াও ৬ই ডিসেম্বর/৯৮ইং তারিখে জনসংহতি সমিতির প্রধান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে চেয়ারম্যান (প্রতি মন্ত্রী পদ মর্যাদা) করে ২২ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।এবং বান্দরবান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহদুরকে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়াও সাবেক অতিরিক্ত সচিব শ্রী শরদেন্দু শেখর চাকমাকে ভূটানের রাষ্ট্রদূত এবং যুগ্ন সচিব শ্রী তারা চরণ চাকমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন, শরণার্থী টাস্ক ফোর্স গঠন করে সম্পাদিত শান্তিস্থ চুক্তি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার।

অপরদিকে বি,এন,পি'র বেগম খালেদা জিয়া সরকারের ধারাবাহিকতায় শান্তিস্থ চুক্তি সম্পাদিত হলেও সেই চুক্তি কালো চুক্তি ও সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিয়ে চুক্তির বিরোধিতায় বি,এন, পি রাজ পথে আন্দোলনের ডাক দেয়।
১লা অক্টোবর ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় বি,এন,পি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত নিজ দলীয় সদস্য শ্রী মনি স্বপন দেওয়ানকে উপ-মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং খাগড়াছড়ি আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়।

বলা বাহুল্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য বিড়ম্বিত আদিবাসী মানুষ কিন্তু এখনো ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত। পার্বত্য শান্তিস্থ চুক্তি যে দলের সরকারই করন্নক না কেন, চুক্তি হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। তাছাড়াও এই চুক্তির শুরন্নতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা দরকার। চুক্তি বাস্তবায়ন দাবী করা রাষ্ট্রীয়

বিরোধী কোন কাজ নয়। তাই পেশাজীবি, সরকারী-বেসরকারী চাকুরিজীবি, মজুর শ্রমিক সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তি বাস্ত্মবায়নের সামিল হই। চুক্তি বাস্ত্মবায়নে কাজ করতে গিয়ে চাকুরীজীবিদের চাকুরী হারানোর ভয় আছে বলে মনে করি না। কারণ এই চুক্তি রাষ্ট্রীয় বিরোধী নয়। চুক্তি হয়েছে সম্পূর্ণরূপে সাংবিধানিক আওতায় এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানাই।। তাই চুক্তি বাস্ত্মবায়নই হোক প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র-দায়িত্ব ও দীপ্ত অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র:

(১)Introduction of Chakmas, Pages-2 L.B Chakma Autonomous District Council Silver Jubilee souvenir-1997, Mizoram,India,
(২) শ্রী রূপায়ন দেওয়ান মহোদয় কর্তৃক শুভলং ম্যাগাজিনে লিখিত প্রবন্ধ।
(৩) চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, শ্রী বিরাজ মোহন দেওয়ান।

.....

শ্রী প্রগতি খীসা, বিশিষ্ট কবি ও সংগঠক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

জির কুং সাহু

বম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান জীবিকা পদ্ধতি

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রন্নমা, থানচি, রোয়াংছড়ি এবং বান্দরবান সদর থানা ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি- পাঁচটি উপজেলায় ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করেন। ২০১১ সালেল সর্বশেষ আদম শুমারি অনুযায়ী বমদের জনসংখ্যা ১১, ৩৬৭ জন। নিম্নে ১৮৭২ সাল থেকে ২০১১ সালের বম জনসংখ্যা দেওয়া হলো।

১৮৭২ সাল	১৯০১ সাল	১৯৫৯ সাল	১৯৮১ সাল	১৯৯১ সাল	২০১১ সাল
৩০৫	৬৯৬	৯৭৭	৭৩৩	৬,৬৭৮	১১,৩৬৭

দুর্গম পাহাড়ের গহীন অরণ্যে বমরা বসবাস করেন। শিকারি স্বভাবের এ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা অবলম্বন জুমচাষ। জুমচাষের পাশাপাশি বছরের অধিকাংশ সময় তাঁরা গহীন অরণ্যে শিকার করেন। স্বাভাবিকভাবে জুম চাষ ও শিকারের জন্য কুমারী বনাঞ্চলে (virgin forest) তারা বসবাস করেন। এ জন্য নিজ জনগোষ্ঠী ছাড়া সমতলে বা অন্য জনগোষ্ঠীর লোকলয়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত্ম কম। গহীন অরণ্য, পাহাড়, পাহাড়ি ঝরণা অর্থাৎ অকৃত্রিম

প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা প্রকৃতির মতো সহজ-সরল তাদের জীবনধারা। অপ্রবেশগম্য ভূগৌলিক অবস্থান ও দুরত্বের কারণে তাঁরা সরকারি উন্নয়ন সুযোগ বঞ্চিত এবং অন্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়া। বর্তমানে তাঁরা টিকে থাকার নানা মাত্রিক হুমকির মধ্যে রয়েছেন। বেশিদিন হয়নি তাঁরা কালের বিবর্তন ও যুগের চাহিদায় তাঁদের এ পিছনে পড়া ও টিকে থাকার নানা মাত্রিক ঝুঁকির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই বিলম্বে হলেও সমকালের সঙ্গে এখন নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

বম আদিবাসীদের প্রধান জীবিকা জুম চাষ তা আগেই বলা হয়েছে। শুধুমাত্র খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা খোরাকি অর্থনীতির জুমচাষ এক সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর অবলম্বন ছিল। সারা বছরের খোরাকির জন্য ধান এবং অর্থকরি ফসল- মরিচ, কার্পাস তুলা, তিলের উৎপাদন ছিল খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট। কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- লবণ, তেল, দা, কুড়াল ইত্যাদি ছাড়া বাইরের কোনো কিছু তাঁদের প্রয়োজন ছিল না। জুম থেকে উৎপাদিত তুলা থেকে নিজেরা নিজেদের কাপড় তৈরি করতেন। ব্যাপক তুলা উৎপাদন ও দ্রব্য বিনিময় শুল্ক হিসেবে চট্টগ্রামের মোগল শাসকদের তুলা দেওয়া হতো বলে সেই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্পাস মহল বলা হতো। মূলতঃ জুমচাষ ও শিকারের সহজলভ্যতার কারণে বম আদিবাসীরা গহীন অরণ্যের পাহাড়ের চুড়ায় বসতি স্থাপন করে বসবাস করেন। এ জন্য ক্যাপ্টেন টিএইচ লুইন তাদের তথা বা পাহাড়ের সন্ত্মান বলেছেন। নদী তীর ও সমতলে- এমনকি সাংগু নদ অথবা তারাছা খালের সংকীর্ণ উপত্যকায় ছিটেফোটাও যেখানে সমতল রয়েছে, সেখানেও বমদের আদি বাস স্থান দেখা যায় না। গহীন অরণ্যে জুমচাষ, বন্যজন্তু জানোয়ার ও পশুপাখির পিছনে পিছনে ছুটে বেড়িয়েছেন। কিন্তু এককালে ফলন প্রাচুর্যের জুম চাষ এখন নানা কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ায় সহজ-সরল জীবনেরও চাহিদা মেটাতে পারছে না। পাহাড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জুমচক্রের (কোনো স্থানে একবার জুমচাষ করার পর প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য পতিত রাখার সময়কে জুমচক্র বলা হয়। কারণ প্রাকৃতিক বনাঞ্চল না হলে জুম হয় না) সময় হ্রাস পাওয়া, ভোগবাদি বহিরাগতের ভোগবাদিতায় বনজ সম্পদ আহরণের নামে বনাঞ্চল উজাড়িকরণে রন্নড়া ও ন্যাড়া পাহাড়ে উর্বরাশক্তি শেষ হয়েছে। এ জন্য পাহাড়ের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো বমরাও জুমের বিকল্প হিসেবে ফলদ ও বনজ বাগানের দিকে জীবিকার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

১৯৮০ এর দশক থেকে বমরা সনাতনী জুম অর্থনীতির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে রড়্গা পাওয়ার উপায় হিসেবে ফলজ বাগান, সবজি চাষ অর্থাৎ হর্টিকালচারে ও বনজ বাগান সৃজন শুরন্ন করেন। দ্রন্নত সমাজের উলেস্নখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অতি সহজে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এটিকে বেঁচে থাকার নির্ভযোগ্য ভবিষ্যৎ হিসেবে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে বম পরিবারগুলো নদী তীরের কাছাকাছি পাহাড়ে, অপেড়্গাকৃত যোগাযোগ সুগম বাজারের কাছাকাছি এলাকায় নেমে আসেন। রন্নমা উপজেলা সদর বাজারের ১ থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে বেথেল পাড়া,

এডেন পাড়া, লাইরম্ননপি পাড়া, মুনলাই পাড়া, এলিম পাড়া, বেথলেহেম পাড়া, নাজারেথ পাড়া ও রিসংসং/Tlangnuam পাড়াসহ বিভিন্ন পাড়া গড়ে ওঠে। ওই সব পাড়ায় ৩৭০ বম পরিবার ফল সবজি চাষ করে জীবনধারণ করছে। বান্দরবান জেলা শহরতলিতেও বমরা বসতি স্থাপন শুরম্ন করে। তখন বান্দরবান-চিম্বুক সড়কের লাইমি পাড়া, ফারম্নখ পাড়া, শারন পাড়া, গ্যেৎশিমানি পাড়া, বালাঘাটা ও মেঘলা এলাকায় হেব্রন পাড়া, চিনলুং পাড়া, কানা পাড়া এবং ডারসন পাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের কাছাকাছি আরো ৪টি বম বসতি গড়ে উঠেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি বর্তমানে ১১০০ বম আদিবাসী পরিবার পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে জুম চাষ পরিত্যাগ করে নিজেদের নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত্ম পাহাড়ে ফলদ বাগান ও সবজি চাষ করে জীবনধারণ করছে। যা বম সমাজের ৩৮ ভাগ। তাদের উৎপাদিত প্রধান ফল হলো আনারস, কলা, পেঁপে, আদা, কচু, কাজু বাদাম, আম, কাঠাল প্রভৃতি।

বম আদিবাসী লোকেরা ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে পারিবারিক খাবারের জন্য হর্টিকালচারের দিকে মনোনিবেশ করে। তাঁরা উৎকৃষ্টমানের আনারস, কলা ও কমলা বাগান করেন। কালুরঘাটস্থ মাল্টিপল জুস পস্নান্টে (Multiple Juice plant) কিছু আনারস সরবরাহ ও বাজারের বিক্রীর করা হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণে ন্যায্য দাম না পাওয়া, সংরড়্গণ ও গুদামজাতকরণের কোন ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদির কারণে উৎপাদন কমে যায়। মাটির উর্বরাশক্তির ড়্গয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফলের গুণগতমানের ক্রমোবনতি হতে থাকে। আনারস আকারে ছোট হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা, ভাষার সীমাবদ্ধতা ও সমতল এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা, ব্যবসার নিয়মনীতি বা কলাকৌশল না জানা প্রভৃতির কারণে প্রধান অর্থকরী ফসল আনারস চাষে উৎসাহ ক্রমশ কমছে। দ্রম্নত পচনশীল বলে ঝুঁকিও অনেক।

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলনের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা বা উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। আরেকটা কথা, যেসব পরিবার ফল চাষ করছে তাদের সবার নিজস্ব বন্দোবস্ত্ম পাহাড় বা বাগান নেই। পাড়া-পড়শী এবং কাছের আত্মীয়স্বজনদের পাহাড়গুলো ভাগাভাগি করে আছে। এক পরিবারের গড়ে ৫ একরের বেশি বন্দোবস্ত্ম নেই। সেই ৫ একরের সব পাহাড় তো আবার চাষের উপযুক্ত নয়। খাড়া অথবা এবড়ো থেবড়ো শিলাময় পাহাড় কাজে আসে না। কম মূল্যবান গাছ-গাছালি, ছোট ছোট বাঁশ, লতাগুল্ম ছাড়া এসব জায়গায় কিছুই হয় না। চুপচাপ, স্বল্পবাক, শান্তিপ্রিয় ও গুটানো স্বভাবের বম আদিবাসীরা কখন ব্যবসা-বাণিজ্যে, বাজারঘাটে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে এখন দড়্গ নন। লজ্জা সংকোচ যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। অন্যের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়ে সে নিরপেড়্গ থাকে বা অন্যকে জিতিয়ে দেয়।

সমবায়ের ভিত্তিতে এই জড়তা কাটিয়ে ওঠা যায়। প্রয়োজন উদ্যোগের। জ্ঞান বিদ্যাওয়ালা হাতে গোণা কয়েকজন বম নেতৃবর্গ আছেন এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ দেওয়া অতি জরম্নরি। বম আদিবাসী ৮০ ভাগ অড়্গারজ্ঞান সম্পন্ন। তবে বাংলায় নয়। ইংরেজী বর্ণমালায় মিশনারীদের প্রবর্তিত কায়দায় অবলীলায় বম শব্দগুলো লেখা যায়। এ লেখা ১৯১৮ সালে ভারতের মিজোরাম থেকে আগত স্বগোত্রীয়রা বমদের মধ্যে প্রচলন করেন। সমবায়ের শিড়্গাদান ও পরিচালনায় এই অবস্থা খুবই সহায়ক হবে। তাছাড়া বর্তমান প্রজন্মের সবাই বাংলায় লেখাপড়া করে। দুয়েকটি বাদ দিলে প্রতি বম গ্রামেই হয় সরকারী নয় নিজেদের উদ্যোগে স্কুল রয়েছে।

বম সমাজের অধিকাংশ পরিবার (৬৮%) এখনো জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে দূর দূর্গম এলাকা- রুমা, রেমাক্রী প্রানসা, রোয়াংছড়ি, তিন্ডু ইউনিয়নে বসবাসকারী বম পরিবারগুলো। এই সব এলাকায় জুমের পাশাপাশি আদা হলুদের চাষ বেশ বিস্ত্মার লাভ করেছে, কিন্তু আদা চাষ খুবই ঝুকিপূর্ণ বলে আদার উপর নির্ভরও করা যায় না। পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকায় এই সব এলাকায় দ্রুত পচনশীল ফল যেমন আম- আনারস চাষ করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। শীতকালীন ফল চাষে গুরুত্ব দেয়া যায় যেমন কূল, পান্যাগুলা, আমলকি, মাল্টা, তেজপাতা, গোলমরিচ, কাজুবাদাম ইত্যাদি অর্থাৎ যে ফলগুলোর ওজন কম, কিন্তু দাম বেশী; আর এইসব পাহাড়ে সম্ভাবনা রয়েছে এলাচি, লবঙ্গ, জায়ফল ইত্যাদির।

গবাদী পশুপালন এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র- মুরগী, ছাগল, গরু পালন। একসময় গয়াল পালনে বমদের খুব সুনাম ছিল। গত বছরের এক সমীক্ষায় রেমাক্রী প্রানসা এলাকায় ১৫০০ এর মত হিসাব পাওয়া গিয়েছে। গবাদী পশু আমাদের একটি অন্যতম অর্থকরী সম্পদ, এই দূর্গম এলাকার জন্য পশুপালন ক্ষেত্রটি একটি বিপুল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। জুম চাষের পাশাপাশি পশুপালন এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটির উন্নয়ন কল্পে এই সব এলাকার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যায়। এ ক্ষেত্রটি গুরম্নত্ব পাচ্ছে কম। গবাদি পশু পালন, জাত উন্নয়ন, সুষম খাদ্য সরবরাহ ও সঠিক বাসস্থান প্রদান, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে গবাদি পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জুম চাষের জমির স্বল্পতা, দক্ষতা ও পুঁজির অভাবে বিভিন্ন পেশা গ্রহনে সীমিত সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে সরকারী/বেসরকারী চাকুরী লাভে অসমতা ইত্যাদির কারণে এ অঞ্চলের মানুষের আয় ও জীবন যাত্রার মান নিম্ন পর্যায়ের। অবাক হওয়ার মত তথ্য হল যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া কোন বম সরকারী অফিসে কর্মরত নেই । বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ঘুরে আসুন, সেখানে একজন বমও নেই। বারো হাজার মানুষের মধ্যে একজনও যোগ্য ছিল না? এ কেমন বঞ্চণা?

একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দেয়া উচিত তা হল বম লোকেরা মোটেই মিতব্যয়ী নয়, সঞ্চয় মনোভাব মোটেই নেই, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা এখনো তাদের মাথায় কাজ করে না। সঞ্চয় প্রবণতা জাগ্রত করার অন্যতম প্রক্রিয়া হল নিয়মিত সঞ্চয়। একথা সত্য কোন একজন যদি নিয়মিত জমা করার অভ্যস্ত না হয়ে থাকে কিংবা জমা করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না থাকে, তার কাছে সঞ্চয় করা খুবই কঠিন বলে মনে হবে। স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষদের কঠিন কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়ে সঞ্চয়ের কাজটি সমাধা করতে হবে। বমদেরকে সঞ্চয়ের অভ্যাসে অনুপ্রাণিত করা উচিত ।

.....

জির কুং সাহু, বিশিষ্ট লেখক ও উন্নয়ন কর্মী বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

হাফিজ রশিদ খান

বিঝু-বৈসুক-সাংগ্রাই-বিহু... : প্রাণে প্রাণ মেলানোর উৎসব

ফরাসি দেশের এক দার্শনিক, জাক লাকাঁ তার নাম, বলেছিলেন : বড় শামিয়ানার নিচে অনেক-অনেক মানুষকে জড়ো করার চেয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছোটো ছাতা ধরিয়ে দিতে হবে। তাহলে তারা নিজেদের মতো করে রোদবৃষ্টির মোকাবিলা করতে শিখবে। বেঁচেবত্তে থাকার কায়দা-কানুন রপ্ত করতে পারবে। কথাটাকে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ আর সময়োপযোগী মনে হওয়ায় ওটা দিয়েই লেখাটা শুরম্ন করলাম। এ-বাক্যের অনুধাবনার ভেতর দিয়ে একটি বৈপস্নবিক পরিবর্তনের পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের উৎসমুখ একবিংশ শতাব্দী– যার পরিম-লের দ্বিতীয় দশকে এখন আমাদের বসবাস।

মানুষের সভ্যতা বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে এসেছে, ইতিহাস বলে। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ইত্যাদি। যেহেতু প্রাচীন যুগ না পেরম্নলে মধ্যযুগ আর মধ্যযুগ না পেরম্নলে আধুনিক যুগে পা রাখা যায় না, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, আধুনিক যুগও কি ফুরিয়ে যায়নি আজও? অভ্যস্ততার অনুবৃত্তি হিসেবে আধুনিকতার ব্যবচ্ছেদ করে ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরার বক্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য, বলেন তিনি : 'যিনি আধিকাংশকে খুশি করতে চান, তাকে সবাই যা পছন্দ করে তা নিশ্চিত করতে হয়, তাকে পুরনো ধারণার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হয়। প্রচার মাধ্যমের কাজটি ঠিক অনুরূপ। প্রচার মাধ্যমের এই অধিকাংশ খুশি করার প্রচেষ্টা আমাদের জীবনের শৈল্পিক ও নৈতিক বিধানে পরিণত হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আধুনিকতা বলতে

গৃহীত ধারণাবলীর বিরোধিতা করাকে বুঝাতো। কিন্তু আজ আধুনিকতার ধারণা প্রচার মাধ্যমের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। আধুনিকতা এখন মিলিয়ে চলা, মেনে নেয়া, পুরোপুরি মেনে নেয়াকে বুঝায়। আধুনিকতা এই অধিকাংশকে খুশি করার প্রয়াসের পোশাক পরেছে। গৃহীত ধারণাবলীর প্রতি নিরাসক্ত থাকা ও অধিকাংশকে খুশি করার প্রয়াস একই জিনিস। এ হচ্ছে তিন-মাথা বিশিষ্ট শত্রম্ন, যার জন্ম ঈশ্বরের হাসির প্রতিধ্বনিরূপে। (জেরম্নজালেম বক্তৃতা)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর নৈতিক বিপর্যয়, মানবিক সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষায়, আণবিক বোমার বর্ষণ, অবদমন আর নেতিচেতনার বিচিত্রবিধ গলিঘুঁজি ও আলো-অন্ধকার পেরোনো আধুনিকতার রথে জং ধরেছে, সন্দেহ নেই। তাই জবাব হচ্ছে এই : হ্যাঁ, এখন আধুনিকোত্তর, উত্তর আধুনিক বা পোস্ট মডার্ন যুগই চলছে আসলে আমাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। তার আলামতও চারপাশে সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে শিল্পকলায় সাহিত্যে ধর্মচিন্তায় চলচ্চিত্রে ফ্যাশনে সঙ্গীতে নির্মাণে আর চলমান জীবনধারার একেবারে হালহকিকতে। চড়্গুষ্মান ও খাস চেতনার বাসিন্দারা ঠিকই তা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করছেন। সে অর্থে এখন জগতের সকল মানুষই, প্রকৃত বিবেচনায়, আধুনিকোত্তর সময়ের বিশ্বনাগরিক বই নয়।

জাক লাকাঁ আসলে ওই উক্তির মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দি ও তার পূর্বেকার সমস্ত তামাদি মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্যালুট দিয়ে চিরবিদায় জানিয়েছেন। অর্থাৎ বিশ শতকীয় সময়চেতনা ও তার পড়ো গৃহীত-কৃত প্রস্তাবনা ও করণকৌশলসমূহ আর প্রত্যাবর্তন করবে না। যত বিরাটত্ব, মহত্ব, সৌন্দর্য আর সম্ভ্রান্তমতা তার ভেতর থাকুক না কেন। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিকের সেই আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্য, তার বীরোচিত স্বৈরাচারী নৃপতিবৃন্দ – দারায়ূস, আলেকজান্ডার, অগাস্টিন, হর্ষবর্ধন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, অজাতশত্রম্ন, মোগল আকবর, এমন কি মহামতি লেলিন কি যোসেফ স্ট্যালিন একালের আয়নায় আর প্রার্থিত মুখাবয়ব নয় মোটেও। সেই ভূরাজনীতি, সেই মনুমেন্টাল ফিগারের প্রতি নতজানু মানবমনের সেই পরিপ্রেক্ষিতও আর অবশিষ্ট নেই। এ হল সময়ের অভ্রান্তস্ত, অনিবার্য তর্জনি সংকেত। শিল্পসাহিত্যেও একই বিধান। বহুমাত্রিক তাৎপর্যভরা জীবনগাথার রূপকার তলস্তয়, পিকাসো, দস্তয়েভস্কি, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরম্নল, জয়নুল-এসএম সুলতানরা পুরাকালের মহত্বের ঘেরাটোপে আরও বহুদিনই স্বপ্ন জাগাবেন হয়তো, কিন্তু সেই বড়ত্বের অনুকরণ-অনুসরণ আর নয়, তা হবে না আর, হবার নয় বলেই।

স্পষ্টতই জাক লাকাঁ এখানে বিংশ শতাব্দির প্রায় শেষপাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়, সেই সূত্রে কম্যুনিস্ট মানবতাবাদের উচ্চাঙ্গিক মহিমার পতন ও তৎপরবর্তী সৃষ্টি নয়া বাস্তবতার সুতীক্ষ্ম অবলোকন সামনে রেখে ওই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছেন, মালুম করতে তা খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কেউ-কেউ হয়তো এর মধ্যে পশ্চিমা পুঁজিবাদী মনোভঙ্গির উলস্নাসজনিত তরঙ্গের সন্ধান পেয়ে এর বিরোধী তত্ত্ব-তালাশে গলদঘর্ম হবেন। বস্তুত তা

ফসিলের জন্যে মায়াকান্না বলে দ্রম্নত প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জাক লাকাঁ সময়ের ধমনীতে প্রকৃত টংকার তুলেছেন, তাতে সংশয় নেই বিন্দুমাত্র । বরং এ চেতনা সামনে রেখে একালের ভাবনারাশি চালিত হচ্ছে এই ভেবে যে, তৃতীয়বিশ্বের স্বল্পোন্নত কি অনুন্নত দেশজাতিগুলো এ শতকের পরিবর্তমান সময়প্রবাহকে কীভাবে নিজেদের অস্থিত্ব রড়্গার পড়্গে কাজে লাগাবে।

এড়্গেত্রে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন, তাদের সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক অভিপ্রায়সমূহ নিশ্চয়ই একই প্রবাহের ভেতর চলমান। অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হার মানানোর বেগবান গতির একালে আমরা কি রড়্গাণশীলতার দুর্গে আশ্রয় নেবো, নাকি দেশজ জীবনধারার নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, রঙ ও রূপের সমন্বয়ে একটি সচল, অন্যরকম জাতীয় অবয়ব রচনায় ব্রতী হবো?

সাধারণভাবে আবহমানকালের বাংলা ও বাঙালির জীবনধারায় সমন্বয় ও আত্তীকরণের বিষয়টি গৌণ নয়। বেশ পরিচ্ছন্ন ও আয়ত আকারেই এ সমন্বয়ের অনুষঙ্গগুলো দৃশ্যমান। বলতে হয়, ওই সমন্বয় চেতনাটি কোনো ভাবাবেগ বা কল্পনাবিলাস থেকে উপজাত নয়। মানুষ অস্থিত্বের প্রগাঢ় দাবিতে বিপন্ন ও বিষণ্ন অবস্থায় অনেকটা কেজো বৃদ্ধির অনুরোধেই সমন্বয়ের পথে জীবনের সুতো ঝুলিয়ে রেখেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টি চেতনায় একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষমাত্রই জাত রড়্গাণশীল। এটা জীব ও প্রাণিজগতেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শুধু দুর্যোগ-দুর্বিপাকের অনুমানে বা তার মুখোমুখি হওয়ার শংকায় কি মানুষ কি জীব কি প্রাণি সকলেই স্বতন্ত্রতার নির্মোক খুলে ফেলে এক হয়েছে, বেঁচে থাকার নতুন চুক্তিনামা নির্মাণ করেছে। যেমন এদেশের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস কি প্রাকৃতিক বড় ধরনের সংকট সমস্যায় বিপন্ন মানুষ ও বিষাক্ত প্রাণির সহবাস লড়্গ করা যায় একটি ভাসমান কাঠখ-কে অবলম্বন করে। এ দুর্বিপাকের আগে তারা পরস্পর শত্রম্ন হলেও সংকটের উপস্থিতিতে উভয়েই স্বভাবসম্মত স্বতন্ত্রতায় ছাড় দিয়ে সম্প্রীতির সহাবস্থান নির্মাণে বাধ্য হয়। চলমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের দুর্বার অভিযাত্রায় বাংলাদেশ ভূখ- বসবাসরত আদিবাসীসহ সকল মানুষের বেলায় এ কথার সত্যতা অনুধাবনার সময় সমুপস্থিত বলে মনে হয়। বহুজাতিক পুঁজির সৌজন্য ও প্রকৌশলসম্মত নিখুঁত বিস্থার ও প্রয়োগে এদেশের সাধারণ মানুষ না পারছে এর বিরোধিতায় জোরালো অবস্থান নিতে, না পারছে এর স্মিত, উদার আহবানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখতে। স্বীকার বা অস্বীকারের বিষয় নয় এটি, বরং বাস্থবতার কাচস্বচ্ছ অবলোকন থেকেই লড়্গ করা যাচ্ছে, বাংলার আদিবাসী ড়্গুদ্র কি বড় জনজাতিগুলো ওই বহুজাতিক পুঁজি ও তার ছোটো-ছোটো প্যাকেজ প্রোগ্রামের পড়্গপুটে আশ্রয় নিচ্ছে বেশ। কারণ সেখানে তারা পাচ্ছে জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার অর্থনৈতিক সুরাহা – সেই সূত্রে জাগতিক নিরাপত্তা ও মনোজাগতিক কিছু প্রশান্থিও। বিষয়টি যত বিতর্কেরই জন্ম দিক না কেন, যেহেতু ওই জীবন-চাহিদা ও টিকে থাকার প্রশ্নটা বড়, অতএব, অন্যসব গৌণ বটে। এখানে আদর্শবাদ ও বড় পরিপ্রেড়্গিতের রাজনৈতিক কমিটমেন্টের দীর্ঘস্থায়ী প্রচার-প্রপাগেন্ডা খুব একটা ফলপ্রসূ রূপ পাবার আশা

পরাহত। কেননা বিংশ শতাব্দির অভিজ্ঞতা থেকে একবিংশে পদার্পণকারী বিশ্বমানবতা দেখেছে, 'বড়'র পিরিতি' সত্যিকার অর্থেই বালির বাঁধ বই নয়। সে দার্শনিক প্রত্যয়ে হোক, ভূরাজনৈতিক অর্থে হোক, জাতিগত কি সম্প্রদায়গত অর্থেই হোক। ড়্গুদ্র বলে, সংখ্যালঘু বলে জাতিরাষ্ট্র যদি কোনো না কোনো দিক থেকে বৈষম্য কি অবহেলার তাস ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে, তা নিরবে-নিভৃতে হজম হবার সময় নয় এখন। নানা প্রযুক্তিগত অন্থর্জাল কিংবা ব্যক্তিচেতনার উন্মাদনায় তার বিপড়্গে ডালপালা বিস্থার এখন সহজ, অবশ্যম্ভাবী।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি উলেস্নখযোগ্য দিক হচ্ছে, এ সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থা বহিঃপুঁজি, বহিঃসংস্কৃতি কিংবা ধ্যান-ধারণাকে অবরম্নদ্ধ করে রাখতেও সমর্থ নয়। তথ্যের অবিরল আদান-প্রদানে যে বিপুল তাৎড়্গণিক প্রতিক্রিয়া সম্ভব হয়ে ওঠেছে একালে, তার অনিবার্য পরিণতিই নিয়ে এসেছে জনগোষ্ঠিতে-জনগোষ্ঠিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিপুল সচেতনতাবোধ। আর এই সচেতনতাকে হত্যা করার কোনো লৌকিক-অলৌকিক তরিকা এ সময়, এ কালপ্রবাহ মেনে নিচ্ছে না। কাজেই খুব গভীর সংবেদন ও সহভাগিতার অনুভূতি নিয়ে দেশজ সংস্কৃতির ড়্গুদ্র-ড়্গুদ্র পরিম-লগুলোতে নজর ফেলার দাবি আজ বাড়ছে দিন দিন বাংলাদেশেও।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলোর উৎসব, মেলা ও সার্বজনীন পালা-পার্বণগুলোর একটা ফলপ্রসূ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এর মধ্যে 'বৈসাবি' একটি উলেস্নখযোগ্য আদিবাসী মিলনমেলা। ত্রিপুরা জাতির 'বৈসু' বা 'বৈসুক', মারমা জাতির 'সাংগ্রাই', তনচংগ্যা ও চাকমা জাতির 'বিষু' ও 'বিজু'র আদ্যড়্গর নিয়ে 'বৈসাবি' শব্দটি নির্মিত হলেও এ উৎসব কিন্তু প্রতীকী তাৎপর্যে সকলের সঙ্গে সংহতি ও সমন্বয়ের কথাই বলে। আরও যে-ড়্গুদ্রজাতিগুলো আছে পাহাড়ে, যেমন : লুসাই, পাংখো, বম, খুমি, চাক, ম্রো বা মুরং, খিয়াং – এরাও নতুন বছরের সংক্রান্থিকে মিলনের, আনন্দের, দুঃখভোলার, পুরনো বেদনা মুছে ফেলার আবেদন থেকেই বিচার-বিশেস্নষণ করে। এ বাঁধভাঙা অংশগ্রহণের মহাস্রোতে ওই অঞ্চলের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমানরাও শামিল হতে অন্থরের তাগিদ অনুভব করে পারিপার্শ্বিকতার উদারতার আবহে। এ যেন রবিঠাকুরের 'আজি সবার রঙে রং মিশাতে হবে'রই বাস্থব প্রেড়্গিত।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রায় পঞ্চাশ লড়্গ মানুষের প্রত্যড়্গ-পরোড়্গ প্রভাব, পণ্যসামগ্রী বেচাকেনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবের এ বৈসাবি বিভিন্ন প্রান্থিকতাকে এনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় একেবারে অকৃত্রিম নৈকট্যে। এতে সকলের মনোদেশে অজান্থে জাগে অসাম্প্রদায়িকতার অনুভূতি, বহুস্থরিক সংস্কৃতির দিগন্থ হয় উন্মোচিত। বিগত বছরের শ্রমজ ঘাম, অশ্রম্নকণা, বিসর্জন ও অর্জনের আলোছায়ায় মায়াবী জীবনের নতুন আল্পনা আঁকে এ সহজিয়া সম্মিলন। বাসন্থী স্নিগ্ধতা আর গ্রীষ্মের দাবদাহের সন্ধিড়্গণের প্রকৃতি ও জীবনের দিকে মানুষের পড়্গপাতকে এ উৎসব এমন নগ্ন ও দর্শনীয়ভাবে তুলে ধরে যে, প্রত্নজীবনের অন্বেষণে হৃদয় ও চেতনায় জাগে বহুদূর থেকে আগত সমমর্মিতার গান। তাই এই উৎসবের কোলাহলে পাওয়া যায় নিজেকে জানার ও অপরে নিজেকে হারিয়ে ফেলার বিরল মানবিক উৎকর্ষ।

এ মেলার জনস্রোতে স্থানিক জীবন, স্থানিক সংস্কৃতির যে সমন্বয়ী অবয়ব ফুটে ওঠে, তার ভেতর আরও পাই জাক লাকাঁর ওই অজর, উদ্ভাসিত উক্তির প্রত্যড়্গা মর্মার্থও। ওই পাহাড় ও ঝিরির, ওই কুহেলি ঝোপ ও সবুজপাতার সান্দ্র আড়ালে ওখানকার ভূমিজ জীবনের যে প্রাণদীপ্ত ক্যানভাস ছড়িয়ে আছে, তা কখনও মলিন হবে না – যদি তাকে নিজের মতো করে বিকাশের পথ করে দেয়া হয়।

বড় শামিয়ানার নিচে তাদের জন্যে ঘেরাবেড়ার দমবন্ধ আয়োজনে ব্যস্ত না থেকে তাদের জন্যে যেন পারা যায় অরণ্য থেকে অরণ্যে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে অবাধে গান গেয়ে বেড়ানোর রৌদ্রোজ্জ্বল ছায়াবীথি খুলে দিতে। সম্পন্ন সহাবস্থানের এ বাতাবরণ নির্মাণ ও তার যথাযথ পরিপোষণে একবিংশের রাষ্ট্রব্যবস্থা সফলকাম হবে, এ কোনো ইউটোপিয়া নয়। মানুষের সৃষ্টিকুশল মস্তিষ্কের নিউরনসজ্জা তা বলেছে শতাব্দিতে-শতাব্দিতে, বিভিন্ন তাৎপর্যবহ উলম্নম্ফনে, উলম্নম্ফনে।

.....

হাফিজ রশিদ খান, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য সম্পাদক দৈনিক সুপ্রভাক, চট্টগ্রাম।

ধীরকুমার চাকমা

মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাষা এবং জাতি এই দুটি শব্দ অবিচ্ছেদ্য। যেন একটি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটি শিশু জন্মের পর তার মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত কথাবার্তা শুনেই সে পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠে। তার ইচ্ছা-আকাঙ্খা, অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা সে সর্বপ্রথম তার মায়ের কাছ থেকেই রপ্ত করে। ভাষা কেহ কেড়ে নিতে পারেনা। একজন মানুষের ভাষা থেকেই একটা জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে জাতি ছোট হউক আর বড় হউক। জাতি থেকে ভাষাকে কখনো আলাদাভাবে ভাবা যায় না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষের ভাষার বিকল্প নেই। কোন কোন দেশে বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রাধান্য পায়। কিন্তু একটি দেশে বহু জাতি,বহু ভাষা,বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাই বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির ভাষা উন্নয়নের লড়্গে United Nations Education,Science and Cultural Organization (UNESCO) কর্তৃক ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রম্নয়ারী,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই ঘোষণা হচ্ছে বিশ্বের সকল জাতিসমূহের ভাষার প্রতি জাতিসংঘের স্বীকৃতি স্বরূপ। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর ইউনেসকো

প্রতিষ্ঠার পর শিড়্গা,বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ড়্গেত্রে অবদানের জন্য ইউনেসকো শান্তিস্ম পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় ১৯৮৯ সালে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেসকো শান্তিস্ম পুরস্কারে ভূষিত হন প্যারিসে,সংস্থাটির কার্যালয়ে। ১৯৯৭ সালের ২ডিসেম্বর,ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (যা শান্তিস্ম চুক্তি নামে সমধিক পরিচিত) সম্পাদনের সুবাদে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন।

সমাজ বিকাশে মানুষের ভাষা:

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভাষার মধ্য দিয়ে মানব সমাজের বিকাশ ঘটেছে। আদিম সমাজে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত (ফল-মূল,কাঁচা মাছ-মাংস ইত্যাদি) খাদ্য যৌথভাবে সংগ্রহ এবং ভোগ করা আর ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভাষার প্রাথমিক রূপ ছিল ইশারা। পরে তার সাথে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যোগ হয়। যেমনি শত্রম্নর পূর্বাভাস পেলে বনের বানর ঝাঁক কিসিরমিসির শব্দ করে পালাতে শুরম্ন করে। অথবা ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বানর তার সঙ্গীদের খোঁজে একটা নীচু কণ্ঠস্বর বের করে ডাকে। আদিম মানুষও এই রকম কণ্ঠস্বর দ্বারা সংকেত দিয়ে শত্রম্নর উপর ঝাপিয়ে পড়ে কিংবা শিকারে বের হয়। মানুষ সভ্য জগতে প্রবেশ করার পর সমাজ বিকাশের পথে ভাষারও বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় মহাজোট সরকারের আমলে বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগে মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিড়্গা আদিবাসীদের ভাষা সংরড়্গাণ ও বিকাশে একটি মাইল ফলক বলা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনীতিক সম্পর্ক, যোগাযোগ,ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ড়্গেত্রে ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের অভ্যন্তরেও সাধারণ প্রশাসন, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কার্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একাধিক ভাষাজ্ঞান গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ছাত্র জীবনে এসব কিছুর প্রাতিষ্ঠানিক শিড়্গা দান করা হয়। কিন্তু মাতৃ ভাষার মতো সহজবোধ্য ভাষা নাহলে শিশুদের মনে এসব বিষয়ে বোধজ্ঞান জন্মানো খুব সুকঠিন ব্যাপার। কারণ এসব বই-পুস্তক যে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত তার সবকটিই হয়তো আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা নয়। সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে একজন আদিবাসী হিসেবে আগে নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে বুঝে নিতে হয়। তারপরেই অন্যকে বিষয়টি বুঝানো সম্ভব হয়। বিশ্বের উন্নত জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসীদের পশ্চাৎপদতার ইহা একটি অন্যতম কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। এমতাবস্থায় ২০১৭ সালের শুরম্নতে দেশে মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিড়্গার উদ্যোগ নিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিড়্গা মন্ত্রনালয় ; যা আদিবাসীদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি সুসংবাদ বলা যায়। কিন্তু এই উদ্যোগ কেবলমাত্র সরকারের দ্বারা সুসম্পন্ন হবে এমনটা আশা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার অবকাশ নেই। শ্রমসাধ্য এই কর্মকান্ডকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদিবাসী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা পালন করতে হবে। '৫২সালের বাংলা

ভাষা আন্দোলনের পথ ছিল রক্তপিচ্ছিল ও কণ্টকাকীর্ণ। আর এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন বাংলাভাষী ছাত্র-যুব সমাজ। কিন্তু আজকের এই আদিবাসী ভাষা আন্দোলন হচ্ছে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমকে সার্থক করে তুলতে হলে আদিবাসী ছাত্র-যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবিদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ জরম্নরী। এক্ষেত্রে দেশের জাতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবি,সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের সহায়ক ভূমিকা আদিবাসীদের অনুপ্রাণীত করবে ।

ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত:

ভাষা সম্পর্কে পন্ডিতদের মতামত হচ্ছে –" মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এই যে,মানুষ হচ্ছে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন জীব। মানুষের প্রবৃত্তি সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা। অনুভব উপলব্দির সমষ্টি নিয়েই আমাদের জীবন। আর এই অনুভবের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধমেই মানুষ মানুষকে কাছে টানে। গড়ে তোলে সমাজ। সৃষ্টি করে সভ্যতা। আদিম মানুষের ভাষা ছিলনা। তারা আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্ত করত। ---- ------- এভাবেই নির্বাক মানুষ একদিন যখন নিজের অজান্তেই ধ্বনি সৃষ্টি করল,তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর মানুষ একদিন ধ্বনির প্রতীক আবিস্কার করল। এভাবেই সূচিত হল ভাষার মূল ভিত্তি। ভাষা যদিও ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এটি সমাজের সৃষ্টি। অপরের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্যই ভাষার উদ্ভব। নির্জনে নিরালায় ভাষার প্রয়োজন হয়না। চিন্তার জন্য ধ্বনিহীন অব্যক্ত ভাষার প্রয়োজন পড়ে। গ্রীকরা একে বলত 'Logos'। শ্রোতারূপে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ভাষার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। যে পরিবার বা যে সমাজের মধ্যে মানুষ বসবাস করে– সে পরিবার বা সে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তার চিন্তা ,উদ্দেশ্য ও কর্মগত সমস্যা কিছু না কিছু থাকেই। ভাষার মধ্য দিয়েই আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশিত হয়,যা মানুষকে মননশীল ও সভ্য করে গড়ে তুলেছে। যার ফলে মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতিকে বশ করেছে। প্রকৃতিকে বশ করার ক্ষেত্রে সর্বৈব ভূমিকা রয়েছে ভাষার। মানুষ জন্মসূত্রে ভাষা পায়না, এটি তাকে অর্জন করতে হয়। শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে অর্থহীন 'আওয়াজ' করে। এই আওয়াজ ভাষা নয়। শিশু তার পরিবেশ থেকে আস্তে আস্তে ভাষা শেখে। সে যখন মায়ের সান্নিধ্যে থাকে তখন মা যে ভাষায় কথা বলেন, সেভাবেই সে রপ্ত বা আয়ত্ব করে নেয়। সেটিই হয় তার মাতৃ ভাষা।

মানুষের রয়েছে একটি উন্নত বাগযন্ত্র; যা অন্যান্য প্রাণীর বাগযন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আদিম মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করত, সেগুলোই হচ্ছে ভাষার প্রাচীনতম রূপ। ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা আরো বলেছেন, বাগযন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট ও উচ্চারিত যে সব অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা মানুষ তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশে সহায়তা করে এবং যা একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী এলাকার মানুষের মনোভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাকে ভাষা বলে। ভাষাবিদ পন্ডিতগণ ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন

অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ভাষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা উলেস্নখ করা যেতে পারে। যেমন–

- "মনের ভাব প্রকাশের জন্য,বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিস্পন্ন, কোন বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত,স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত,তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।" –ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ।
- "মনুষ্য জাতি যে সব ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়ে থাকে।"–ড. মুহম্মদ শহীদুলস্নাহ
- "মানুষের উচ্চারিত,অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।" –ড.সুকুমার সেন
- " মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে সমাজভূক্ত জনগণের বোধগম্য যে সমস্ত্ম ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ করে সে সমস্ত্ম ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে।" –ড.মুহম্মদ এনামুল হক
- "এক এক সমাজের সকল মানুষের উচ্চারিত ধ্বনিবোধক ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা"–ড.মুহম্মদ আবদুল হাই । ভাষার উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে নিম্মরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্ণীয়–

১. ভাষা বাগযন্ত্রের সাহয্যে উচ্চারিত ধ্বনি।
২. ভাষার অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান। অর্থাৎ ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টির অর্থ থাকতে হবে।
৩. ভাষা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত। ভাষা মনের ভাব প্রকাশক,অর্থাৎ পরস্পর ভাব বিনময়ের মাধ্যম।" (সৌজন্যে: উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা-অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী +অধ্যাপক ড.সফিউদ্দীন আহমেদ-পৃ: ৪৩)।

পন্ডিতগণের উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে ভাষা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষাও এর বাইরে নয়। আদিবাসীদের সর্ব প্রকার পশ্চাপদতার অবসান ঘটাতে হলে স্বস্ব ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। পৃথিবীতে ভাষার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটেছে। যেমন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক একটি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। তার সাথে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। আইন অনুসারে বিভিন্ন জাতিসমূহের জনগণ সেদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকে। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং এ পর্যন্ত্ম বিভিন্ন আন্ত্মর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষার করেছে। ইতিমধ্যে অনুস্বাক্ষারকারী কোন কোন দেশ আন্ত্মর্জাতিক সনদের কিছু ধারা-উপধারা বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিজ দেশের আইনে অন্ত্মর্ভূক্ত

করে বাস্ত্মবায়ন করেছে। সে সূত্রে ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপ্রত্রে উলেস্নখিত অধিকারসমূহ(সৌজন্যে: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র) বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এমনতাই ছিল আদিবাসীদের প্রত্যাশা। এমতাবস্থায় দীর্ঘ প্রতীড়্গার পর মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিড়্গা দানের পাঠ্যসূচীকে আদিবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছে।

আদিবাসী শিশুদের পাঠ্য বই স্বচ্ছ ও সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ হওয়া চাই:

নানাকারণে আদিবাসী ভাষা বিকাশের গতি খুবই মন্থর। রাষ্ট্রীয় ভাষায় উচ্চ শিড়্গার নামে আদিবাসীদের নিজ ভাষা চর্চাকে প্রায়ই ফেলে রাখার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বলা যায় ইহাও আরেকটা ঐতিহাসিক বাস্ত্মবতা। একবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো যেমনি বৃহৎ শক্তির আগ্রাসনের শিকার, তেমনি দেশের অভ্যন্ত্মরেও পশ্চাৎপদ শ্রেণী তথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়। তার মূল কারণটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। জীবন-যাপনের লড়্গে উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেতে হলে রাষ্ট্র ভাষায় উচ্চ শিড়্গা লাভ করতে হয়। আর আদিবাসীদের ভাষাতো রাষ্ট্র ভাষা নয়। আদিবাসী ভাষা দ্বারা সরকারী কাজকর্ম চলেনা: হয়না কর্মসংস্থান। এই অবস্থা থেকে শাসকগোষ্ঠীর ভাষাকে উন্নত ভাষা মনে করা হতো। অপরপড়্গে মনে করা হতো যে, আদিবাসীরা যেমনি পশ্চাৎপদ তেমনি তাদের ভাষা সংস্কৃতিও যেন সেকেলে। অথচ আদিবাসীদের বহু ঐতিহ্যবাহী ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা সুপ্রাচীন কালের। অতীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এতদিনে সেগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যপটে আসতে পারেনি। বিপরীতে কালের প্রবাহে বিভিন্ন সময়ে অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়ে আসছিল। যার ফলে দিন দিন আদিবাসীদের ভাষাগুলো বিলুপ্তির পথে। শাসক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করছে। আজকাল কোন কোন আধুনিক শিড়্গিত আদিবাসী পরিবারে সাচ্চা আদিবাসী ভাষায় কথাবার্তা কমই শোনা যায়। সাচ্চা আদিবাসী ভাষায় ভাব বিনিময় করতে গেলেও সব কথা বোধগম্য হয়না। অবশ্য বর্তমান সভ্য সমাজে কোন জাতির নিছক একক সমৃদ্ধ ভাষা বলে পৃথিবীতে কোথাও নেই। তবুও প্রগতিশীল ভাবমানস নিয়ে আদিবাসী ভাষা গবেষণা ও চর্চার অপেড়্গা রাখে। তা নাহলে যে মাতৃভাষা দিয়ে আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিড়্গা দান করা হবে; সেখান থেকে আদিবাসী শিশুরা কতটুকু লাভবান হতে পারে তা বাস্ত্মবমূখী বাস্ত্মবতার সহিত ভাবতে হবে। তাদের শিড়্গা দানের জন্য যে পাঠ্য বই ছাপানো হবে সে সব পাঠ্য বই-এ কীভাবে ছড়া, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি লেখা হবে তা আদিবাসী ভাষা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত। স্বভাবতই দেশের প্রগতিশীল লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিদের লেখা এবং আদিবাসীদের গল্প-কাহিনী তথা তাদের পূর্বপুরম্নষদের জীবন সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত বিষয় থেকেই সে সব বই লিখতে হবে। শিশুদের হাতে ভুল তথ্যে ভরা পাঠ্য বই যাতে তুলে দেয়া না যায় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সচেতনতা দরকার। কেবলমাত্র আদিবাসী বর্ণমালা ব্যবহার

বিধি দিয়ে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শিড়্গা কার্যক্রম চালানো যথেষ্ট নয়। তার সাথে পাঠ্য-বই এর মধ্যে আদিবাসীদের ভাষার ধ্বনি তত্ত্ব, ব্যাকরণসহ পূর্ব পুরম্নষদের বীরত্বের গাঁথা, হাসি-কান্নার কথা ইত্যাদি অবশ্যই অন্ত্মর্ভূক্ত থাকতে হবে; যাতে করে শিশুরা নিজেদের সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। তাদের কোমল মন থেকে যেন নিজ জাতি সম্পর্কে যাবতীয় পশ্চাৎপদতার গস্নানি মুছে যায়। তাই আদিবাসী লেখক,গবেষকদের সমন্বয়ে জাতীয় আদিবাসী ভাষা গবেষণা কেন্দ্র ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে উচ্চ শিড়্গিত লোকের অভাব নেই; কিন্তু স্বস্ব ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আধুনিক ও উন্নত জাতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিকাশ ঘটানোর মতো লোকের অভাব রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে,আদিবাসী সমাজে এমন লোক গড়ে উঠেছে যারা একমাত্র শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছাড়া অন্য জাতির ভাষা সংস্কৃতিকে গুরম্নত্ব দিতে অপারগ। আদিবাসী লেখক যারা রয়েছেন তারা নিশ্চয় এবিষয়ে লেখনী ধারণ করবেন। উন্নত সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র ড.লুফর রহমানের 'সুন্দর হওয়া', গল্পের উপমা দ্বারা বুঝানো সম্ভব নয়। তার মধ্যে যুগোপযোগী সংস্কৃতির ধারাকে পুরাতন সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে নুতন ধঙে সাজিয়ে তোলাকেই বুঝায়। আজকে আদিবাসীরা ভূমিহারা হতে পারে,কিন্তু নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি হারা কখনো হতে পারেনা। সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডি পেড়িয়ে বৃহত্তর স্বার্থে আদিবাসী সমাজের প্রথা,রীতি-নীতি সব কিছুকে ধরে রাখতে হবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে হবে অন্যান্য উন্নত জাতির সমতালে। এই গুরম্ন দায়িত্ব আদিবাসী বুদ্ধিজীবি তথা দেশের জাতীয় বুদ্ধিজীবিদের; যারা রাষ্ট্রকে তথা শাসক গোষ্ঠীকে অনায়াসে প্রভাবিত করতে পারেন।

বিশ্বে বর্তমানে ৫০০০ এর অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ৪০ কোটিরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্বের ৯০ টি দেশে বসবাস করছে। এটা অনুমিত হয় যে,সারা বিশ্বের ৬০০০ ভাষার মধ্যে ৫০০০ এর অধিক ভাষাভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। আদিবাসীদের ভাষা এবং তাদের প্রথাগত জ্ঞান মানব সমাজকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তারা বিশ্বের জনসংখ্যার মোট ৫% ভাগ। সেখানে বিশ্ব দারিদ্র্যের ১৫% ভাগ হচ্ছে এই আদিবাসী জনগণ। বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতল মিলে তাদের লোকসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লড়্গাধিক। এই আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব সংরড়্গণের জন্য তাদের ভাষাকে রড়্গা করা জরম্নরী। ২০১৪ সালের প্রথম দিকে সরকারের শিড়্গা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম ধাপে সমতলের গাড়ো, সাঁওতাল ও সাদারি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই ৬ ভাষায় ৬ জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিড়্গাদানের কার্যক্রম হাতে নিয়ে ছয় জাতির শিশুদের স্ব স্ব ভাষায় পাঠক্রম প্রণয়নের জন্য লেখক নির্বাচন করা হয়। এড়্গেত্রে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। আদিবাসীদের সমন্বয়ে আদিবাসী ভাষা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং পাঠ্য বই প্রস্তুত করার বেলায় দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের স্বীকৃত লেখকদের নিয়ে কাজ করতে পারলে আদিবাসীদের কাঙ্খিত লড়্গ্য পূরণ সম্ভবপর। কিন্তু তা যথাযথভাবে না হওয়ায় অতিসম্প্রতি (২০১৭) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া আদিবাসী ভাষায় মুদ্রিত পাঠ্য বই গুলো বিভ্রাতমুক্ত নয় বলে

প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় মতামত অপরিহার্য।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের অবস্থান:

আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৫৪ টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ৩০ লক্ষাধিক মানুষ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা প্রয়োজন। আদিবাসী ভাষা গবেষণাকেন্দ্র থেকে সেখানে তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভাষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। তাই নিম্নোক্ত অঞ্চল সমূহে তাদের সার্বিক অবস্থা জেনে নিতে পারা যায়। এক নজরে তাদের অবস্থান হচ্ছে নিন্মরূপ,–

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীরা হচ্ছে–সাঁওতাল, ওঁড়াও, মাহালী, মুন্ডা, মাহাতো, রাজবংশী, পাহান, সং, রাজুয়ার, মালো, রাই, বেদিয়া, কোল, মুরিয়ার ও বর্মন। দক্ষিণবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীরা হচ্ছে- মাহাতো, মুন্ডা, বাগদী, ভূমিজ, রাই ও রাজবংশী। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা হচ্ছেন- গাড়ো, হাজং, বর্মন, ডালু, কোচ, হাদি, বানাই ও রাজবংশী। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে আপাতত কেবলমাত্র রাখাইনদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কুমিলস্না ও চাঁদপুর অঞ্চলে ত্রিপুরা ছাড়া আপাতত অন্য কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সিলেট অঞ্চলে-খাসি, মণিপুরি, পাত্র ,গারো, খারিয়া, কুত্তি, ত্রিপুরা, মুন্ডা, অহমিয়া, কোল, মাহালি ও সাঁওতাল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খুমি, গুর্খা, অহমিয়া, চাক, পাংখোয়া, লুসাই ও খিয়া (সৌজন্যেঃ কাপেইং ফাউন্ডেশন)। বাংলাদেশে সমতল ও পাহাড়ে সর্বমোট ৫৪ টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে; তাদেরই অংশ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে উলেস্নখিত ১৩ টির অধিক আদিবাসী জাতিসমূহ; যারা চৌদ্দশ সালের পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। ইতিমধ্যে তারা মোগল আমল (১৪০০-১৮৬০) ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী আমল, ব্রিটিশ আমল(১৮৬০-১৯৪৭), পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১) শেষ করে দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ আমল(১৯৭১- ১৭) পাড় করে দিচ্ছে। অতীতে কোন সরকারের আমলেই আদিবাসী ভাষা উন্নয়নে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পরিলক্ষিত হয়নি। অতি সম্প্রতি শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের মতো একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগের পাশপাশি দেশের সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কাম্য।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৩ সালকে বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা, ৯আগষ্টকে আদিবাসী দিবস ঘোষণা; ২০১১ সালের ১৩জুলাই বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠন; সর্ব সম্প্রতি মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের এই পাঠক্রম চালু করণ ইত্যাদি কার্যক্রম আদিবাসীদের উজ্জীবিত করেছে। তারি সাথে এই কাজে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ণ এবং আদিবাসী ভাষা গবেষণা কেন্দ্রের/প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হলে সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যে একটা আস্থার বাতাবরণ তৈরী হবে। আদিবাসী ভাষায় সরকারীভাবে শিক্ষা দান কাজের

সুবিধার্থে ইতিমধ্যে আদিবাসীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, পার্বত্যাঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উদ্যোগে আদিবাসী বর্ণমালাসহ আদিবাসী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একজন আদিবাসী কোন না কোন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জাতি হিসেবে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ পিছিয়ে পড়া বলা যায়। এসব পশ্চাৎপদতা কেটে উঠার জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন সাংবিধানিক অধিকার, আইন অনুসারে সব কিছু রক্ষাণাবেক্ষাণের অধিকার; যা স্বাধীনতা পূর্বকালে কোন সরকার একটি বারও বিবেচনার প্রয়োনবোধ করেনি। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় এখন প্রয়োজন সংশিস্নষ্ট জাতিগোষ্ঠীর নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জাতীয় চিন্তা-চেতনা। তাছাড়া কোন প্রকার সুযোগ এমনিতে সুফল বয়ে আনতে পারেনা। আজকে আদিবাসী ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোন জাতির ভাষা বিলুপ্তির সাথে জাতির বিলুপ্তি অবধারিত হয়। তাই সমূহ এই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন আদিবাসী ভাষাকে বিকশিত করা। একটি ভাষা বেঁচে থাকার সাথে একটি জাতির অস্তিত্বের কথা জড়িত রয়েছে।

আদিবাসী ভাষা চর্চায় ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজের ভূমিকা:

অধ্যয়ণ অনুশীলন ছাড়া মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হয়না। পৃথিবীর যে কোন ভাষাকে সংরক্ষাণ করতে গেলেও সেই ভাষার চর্চা ব্যতিরেকে বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় না। চর্চার মধ্য দিয়েই যেকোন ভাষার বিকাশ ঘটে থাকে। অন্যথায় ভাষা হারিয়ে যায়: তারি সাথে একটি জাতি বিলুপ্তির প্রশস্থ হয়। তাই বলা হয়ে থাকে, "একটি ভাষা তখন হারিয়ে যায়, যখন সে ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ভাষাটি ব্যবহার করেনা এবং তাদের সন্তানদের শেখায় না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাষা সংরক্ষাণ চর্চার ব্যবস্থা না করার কারণে।" তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা রক্ষার জন্য প্রথমত: যেকোন জনগোষ্ঠীর তার নিজের ভাষাকে নিজের পরিবারে ও সমাজে ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত: তাদের সন্তানদের শেখাতে হবে। তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাষা সংরক্ষাণ চর্চার ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের নিজেরদের ভূমিকা কী রকম সেটা সর্বাগ্রে তলিয়ে দেখার আছে। তারপর নিজেদের বর্নমালা ও ভাষায় পড়ালেখা করতে জানা এবং অপরকে শেখানোর ক্ষেত্রে নিজেরা কতটুকু অগ্রসর সেটা তলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। দেশের ৫৪ টির অধিক আদিবাসী রয়েছে যারা নিজস্ব ভাষায় ভাব বিনিময় করতে পারলেও পড়ালেখার স্ব স্ব ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের বেলায় হয়তো এখনো সবাই সমানভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলে দাবীদার তারা রাষ্ট্রভাষা কিংবা শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। যে ভাষায় শিক্ষা অর্জন করেছেন সে ভাষার সংস্কৃতি তাদের নিজেদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। তারা নিজেদের ভাষার চেয়ে রাষ্ট্রভাষায় পারদর্শী হলেও নিজেদের ভাষা চর্চার বেলায় অনগ্রসর রয়ে গেছেন। নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন চর্চার স্থলে শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির চর্চাই করে থাকেন। কিছু উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আজ জীবিকার তাগিদে চিরদিনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। সেখানে একই কারণে সেদেশের ভাষা, সংস্কৃতিকে প্রথম স্থান দিয়ে নিজেকে এবং

নিজ ভাষাকে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থানে বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এভাবে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে নিজেরা হারিয়ে যেতে বসেছেন; হারিয়ে যেতে বসেছে তার মাতৃ ভাষা ; যা আদিবাসী ছাত্র-যুব সমাজ তথা শিক্ষিত সমাজকে অবশ্যই গভীরভাবে ভাবতে হবে।

বংশ শতাব্দীর শুরম্নতে ব্রিটিশ-ভারতের সভ্যতার ক্ষেত্রেও এমনতাই দেখা গেছে। তখন ভারতের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন বলে যারা খ্যাত তারা বাড়ীতে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন, ইংরেজী ভাষী গৃহ শিক্ষক রাখতেন। শুধুমত্রি ভাষা নয়, ভাষার পাশাপাশি ইংরেজ আদব-কায়দাও শিক্ষা দেয়া হত ছেলে-মেয়েদের। ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতি শেখাতে পারলে তবেই তারা উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে নিজেদের মনে করতে পারতেন এমনটি ধারা সেসময় ছিল। আর এক সময় আসলো যখন বিলেতি কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য বিলেতি জিনিস বর্জন করা হলো। ভারতের কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী যখন একজন ব্যারিষ্টার হয়ে বিলেত ফেরত হলেন তখন সাহেবী পোষাক বর্জন করে কদ্দের কাপড় ব্যবহার শুরম্ন করলেন। শুধুমাত্র ভাব বিনমিয়ের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে রেখে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জায়গায় ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরম্নত্ব দিলেন। দেশীয় চরকা দিয়ে কাটা সূতো দিয়ে পোষাক বানানোর জন্য ভারতীয় নারী সমাজকে অনুপ্রাণীত করলেন। এভাবেই ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তখন সমগ্র ইউরোপ এশিয়া মহাদেশ জুড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হাওয়া লেগেছিল। এই হাওয়া কিন্তু বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) আদিবাসী জাতিসমূহকে আলোড়িত করতে পারেনি। যারা শিক্ষিত বলে পরিচিত হয়েছিলেন তারা সরকারী চাকুরী ছাড়া অন্য কোনভাবে নিজেদের জাতীয় পরিচয় তুলে ধরা কিংবা ভাষার ব্যাপারে তেমন কিছুই করার উদ্যোগ দেখাতেও সক্রাম হননি।

১৮৯৫ সালে কৃষ্ণ কিশোর চাকমার জন্ম আর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। তিনি ৪০ বছর বয়সে মৃতু বরণ করেছিলেন। চাকরী জীবনে তিনি ছিলেন একজন স্কুল পরিদর্শক। ইত্যবসরে আদিবাসী জুম্ম সমাজ সংস্কারক হিসেবে কাজ করলেও সময় কিন্তু বেশী পাননি। তার কর্মজীবন ছিল স্বল্প-দৈর্ঘ। তারপরও এই স্বল্প পরিসরে আদিবাসী সমাজে শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছিলেন যে আন্দোলনের ধারা তার উত্তরসূরী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম.এন.লারমা), জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং তাদের সহযোগী নেতৃবর্গের সহযোগীতায় আজকে এতদূর এসেছে। এপর্যায়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আদিবাসী প্রসঙ্গ জোড়ালো হবার পর পরই বাংলাদেশে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির নবজাগরণ হয়েছে; যে ধারার সৃষ্টি ১৯৭০ দশকে। আর আজকে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর এই প্রথম আদিবাসী ভাষায় সরকারীভাবে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই উদ্যোগকে যথযথভাবে সদ্ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়। ভাষাবিদদের মতে বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ ৫০০০ হাজার ভাষায় কথা বলে। তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে ১০টি আদিবাসী ভাষা। আর রয়েছে ১১টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী শিশুদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদানের বেলায় অনেক দূর পথ হাটতে হবে।

এটা নিঃসন্দেহে একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এ পথের শেষ গন্তব্যে পৌঁছাটা নির্ভর করছে শিক্ষিত সমাজ এবং নবীন প্রজন্মের উপর।

উপসংহার: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষিত যুবসমাজ এবং স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র তথা শিক্ষক হিসেবে যে সমস্ত আদিবাসী নারী-পুরম্নষ এবং গবেষক রয়েছেন তাদের শ্রম ও সাধনার উপরই আদিবাসী মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করছে। উচ্চ শিক্ষা লাভের পর সরকারী চাকরী করার ভাবমানসই বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। তাই রাষ্ট্রীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আধুনিক শিক্ষিত মহল অত্যধিক গুরম্নত্ব দিয়ে থাকেন। দেশের উচ্চ শিক্ষিত সমাজ যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন আদিবাসী শিক্ষিত যুবসমাজও এই গতানুগতিকতার গন্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। এই গতানুগতিকতার গন্ডি পেড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একমাত্র নিজেদের পায়ে দাড়িয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবার চেতনাই যেকোন জাতিকে টিকে থাকার পথ দেখাতে পারে। মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সে পথই হোক আদিবাসী তরম্নণ সমাজের পাথেয়।

.....

ধীর কুমার চাকমা, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

আনন্দমিত্র চাকমা

প্রেক্ষিত:সমকালীন চিন্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অধুনা তিন পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশের অপরাপর জেলাগুলো থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ভিন্নতা রয়েছে। এ তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশের বেশীর ভাগ আধিবাসীদের বসবাস।এদের চেহারা গতদিক সবার মঙ্গোলীয় হলেও ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে রয়েছে কিছুটা ভিন্নতা। তাদের প্রতিটি সংস্কৃতি বলয় ঐতিহ্য পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। প্রাচীন লোক সাহিত্য,গীতিনাট্য, পালা, ধাঁধাঁ, কিংবদন্তী, সবকিছুতে রয়েছে কিছু না কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ নিজস্ব ভাবধারা । সে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবধি এখনও জাতি, গোষ্ঠী ভেদে তাদের সেই সংস্কৃতি ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে। কবে থেকে এ সমস্ত আধিবাসী জাতিসত্তা সমূহ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে ইতিহাসবেত্তাগণ কেউ এখনও সঠিক তত্ত্ব তথ্য নিয়ে হাজির হতে পারেননি। তবে তারা যে বহু পূর্বে বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসবাস শুরম্ন করেছে তা একবাক্যে স্বীকার করা যায়।

স্মতব্য যে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিসত্তা সমূহ সবাই কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে জীবন জীবিকা তাদিগে এখানে এসে থিঁতু হয়েছে। তবে এ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসত্ত্বা সমূহ যাযাবর প্রবৃত্তি মনোভাব সম্পন্ন হওয়াতে নির্দিষ্ট কোন জায়গাকে ভিত্তি করে স্থায়ী কোন গ্রাম.নগর বা বসতিপূর্ণ এলাকা গড়ে উঠেনি। তাদের জীবিকা পদ্ধতি বিশেষ করে কৃষি নির্ভর

ও বনের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিবেশ সমাজ সৃষ্টি করতে পারেনি।তবে তাদের জীবনযাত্রা যাযাবর বৃত্তি সম্পন্ন হলেও তারা তাদের সংস্কৃতি,প্রথা,রীতিনীতি ঐতিহ্য কৃষ্টি সংরক্ষণে ছিল যত্নবান এবং রক্ষণশীল। তাদের এসব কিছু ছিল অলিখিত আইন সদৃশ। কেউ সামাজিক বিধিবিধান ভঙ্গ করতো না। কোনসময় কেউ এর যদি ব্যত্যয় ঘটয়া তাহলে তাকে সামাজিক বিচারের সম্মুখীন হয়ে দোষ ভেদে শারীরিক কিংবা অর্থদন্ডে দন্ডিত হতে হতো।এখন এ প্রথা সর্ম্পূন্নভাবে বিলুপ্ত হয়নি, এ সামাজিক বিচারের উপর রয়েছে আস্থা এবং সন্তুষ্ঠি।প্রাথমিকভাবে কার্বারী বা হেডম্যান মহোদয়গণ এর সমাধা করে। তাদের সম্ভব না হলে চিফ বা রাজা চূড়ান্ত্ম রায় দেন। এ সর্বশেষ রায়ের প্রতি সবাই ছিলেন শ্রদ্ধশীল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা। বিশেষে করে শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষণীয়। গ্রামে গ্রামে সরকারী বেসরকারি স্কুল, শহর এবং উপজেলাগুলোতে সরকারি বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়াতে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা হলেও গতিময়টা এসেছে। এরফলে সংস্কৃতি থেকে আসছে দ্রত পরিবর্তন। পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস,জীবনযাত্রা প্রণালী প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষণীয়পরিবর্তন। ধর্মীয় স্রোত্রেও এসছে লড়্গাণীয় পরিবর্তন। গ্রামে গ্রামে বিহার নির্মাণ ,ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি প্রচলন ,প্রবীণ , বিজ্ঞ, ধর্মীয় গুরুন্নদের জ্ঞান গম্ভীর ধর্মালোচনা ধর্মীয় ভাবধারাকে প্রচীন থেকে মৌলিক ধর্মস্রোতে কিছুটা হলেও নিয়ে এসেছে। সুরম্য বিহার ধর্মীয় গুরুন্নদের ধর্মালোচনা এবং ধর্মাচারীদের পদচারণায় এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নব্য অনেক ধর্মীয় তীর্থভূমি। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় ধর্মাচারীদের মাঝে যুক্তির চাইতে ভক্তির পালস্না ভারি হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমরা বাহ্যিকভাবে আচরণিক, আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন আসলে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর মৌলিক আর্দশ প্রতিস্থাপনে ততটা সক্ষম হয়নি তা কেউ পুরোপুরি অস্বীকার করার অবকাশ পাবেন না।

উলেস্নখ্য যে আমরা সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রকম সিরিরাস বা যত্নশীল সে রকমভাবে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যত্নশীল নই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ ছেলেমেয়েরা কিভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জর্জ, ব্যারিষ্টার, উকিল কবি সাহিত্যিক হবে। এসব হওয়ার স্বপ্ন দেখার আগে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বীজ বপন করতে হবে সে বিষয়টি আমরা কেউ মাথায় রাখি না। উচ্চশিক্ষিত হয়ে যদি তার নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকে তাহলে দেশ, সমাজ তার থেকে কি আশা করতে পারে তা সহজে অনুমেয়। তাই বর্তমান সময়ে একজন সুনাগরিক হতে হলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষাকে কোন অংশে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি যে যতই অর্থ, বিত্তশালী কিংবা উচ্চ পাদাসীন হউক না কেন তার যদি নিজের ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা টুকুও না থাকে তাহলে সে সমাজে কিংবা দেবে কিংবা নেবে। আত্বঅহংকার, ভোগ বিলাস তাকে গ্রাস করে নিজস্ব স্বজাতির বৈশিষ্ট্য থেকে বিস্মৃত করবে। শিড়্গার স্রোত্রে লড়্গা টাকা খরচ করে যদি আমাদের

ছেলেমেয়েদের নৈতিকতাহীন সমাজ জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করি, নৈতিকতা শিক্ষার দানে কিংবা ভিত্তি গঠনে ব্যর্থ হই তাহলে এর ভবিষ্যৎ দায়ভার আমাদের উপরই বর্তাবে। তার সুফল এবং কুফলের ভাগীদার আমরাই হবো।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ থেকে ছিটকে পড়বো বা এগুলোকে উপেক্ষা করবো তা সচেতন, বোদ্ধা বিজ্ঞ মহলের কারো কাম্য হতে পারে না। নৈতিকতাহীন শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যক্তির জীবন সমাজে কল্যাণ এবং সম্মানজনক নয়। ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে ভোগ বিলাসের মাধ্যমে বিলাসী জীবন যাপন অপথে কুপথে কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্জন এবং ঐপথেই ব্যয় করে তৃপ্তির ঢেঁকুর গেলেন। এরকম ব্যাক্তি স্বার্থ এবং ভোগ বিলাস জীবন আপাত মধুর। তা কখনও দীর্ঘ কল্যাণ মঙ্গল বয়ে আনে না। তাই বর্তমান সময় এবং বৈশ্বিক পরিবেশ প্রতিবেশকে বিশেস্নষণ করে নিজের অস্তিত্ব,জাতিসত্তা,সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সর্বদিক দিয়ে সুদুর প্রসারী চিন্ত্মা করতে হবে।শুধুমাত্র আধুনিক সভ্যতা শিক্ষা নামক বস্তুর মাঝে নিজের আত্নতৃপ্তির বিষয়টি খুজে পাওয়ার মধ্যে জলাঞ্জলি দিই তাহলে নিজেদের আত্নঘাতির পথ নিজেরাই রচনা করবো তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যতই আধুনিক শিক্ষাই শিক্ষিত হই কিংবা বৈশ্বিক সভ্যতায় নিজেকে সম্পৃক্ত করি না কেন তার উপর আমাদের যে একটা নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বলয় রয়েছে তা স্বরণে রাখতে হবে। আমাদের যুব সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা আধুনিকতার নামে যে অপসংস্কৃতি রপ্ত করছে তা আমাদের জন্য অনেকটা সুখকর নয়।

আমি আগে বলেছি শিক্ষা মানে আপন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কৃষ্টিকে গৌণ মনে করা নয় কিন্তু আশংকার বিষয় যে বর্তমানে আমাদের অত্যাধুনিক সচেতন অভিভাবকরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই এগুলো অনুকরণ করা ছেলেমেয়েদের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন । এতে অনেকে গর্বিত এবং অহংবোধ পোষণ করেন, এরকম আত্নবিস্মৃত মনোভাব সংস্কৃতি র্চচা; আমাদের অস্তিত্ব ক্ষেত্রে অশনি সংকেত বৈকি। শুধুমাত্র বিশ্বাসের অবগাহন করি,তাহলে আমরা মূল লক্ষ এবং উদ্দেশ্য উপনীত হতে পারব না। বলা হয় সঙ্গত নয় যে,ইদানিং ধর্মরক্ষা ধর্মার্চচা; ধর্মাচরনের ক্ষেত্রে লোক দেখানো যে সমস্ত্ম আচার অনুষ্টান বিশেষ করে ত্রিপিতক পূজা, গণশ্রমণ আরো অনেক নতুন ধর্মীয় আচার অনুষ্টান, ইত্যাদি সাধারণ ধর্মানুরাগীদের বিশেষ দৃষ্টি রেখেছে ।বিশেষ ত্রিপিটক পূজায় ভিক্ষসংঘ হতে আরম্ভ করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ছেলেমেয়েরা ধর্মীয় গান হৈ হলস্না, ধর্মীয় শেস্নাগানের মাধ্যমে সারা রাঙ্গামাটি শহর ঘোরাণ হয়। এতে শত শত মোটর বাইক , মাইক্রো ,টেক্সি অংশ গ্রহণ করে।

রাস্ত্মায় শত হাজার ভক্তের ঢল নামে।আসলে এটা ধর্মের অনুষ্টান নাকি নতুন সংযোজন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কোথাও এরকম পূজা পদ্ধতি আছে বলে আমার জানা নেই। বুদ্ধের জীবদ্দশায় দেশিত চুরাশি হাজার ধর্ম স্কন্ধের সামর্থ অনুযায়ী অনুস্মরণ,প্রতিপালন করাই হচ্ছে প্রকৃত ত্রিপিটক পুজা। আর একে আমরা যদি বস্তু পূজা বা অন্য কিছুতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে বুদ্ধের মূল শিক্ষা এবং আদর্শ হতে ক্রমান্বয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? বাস্ত্মব

জীবনে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যদি প্রতিফলন ঘটাতে না পারি তাহলে তার ফলে আমরাই ভাগীদার হবো।

পরিশেষ বলতে চাই, বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন যাত্রা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে খুকই সংকীর্ণ সময় অতিক্রম করছে। বৈশিক তথা বৃহৎজাতিগোষ্টির সাথে বিভিন্নভাবে তাল মিলাতে গিয়ে আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতি,ঐতিহ্য,প্রথা ,ধর্মের মৌলিক ভাবার্দশ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছি। পুরাতন বিদায়,নতুন সংযোজন এই পালাবদল সর্বড়্রোত্রে পরিলড়্রিাত হচ্ছে। এগুলো রপ্ত কিংবা আয়ত্ব করতে গিয়ে জাতিসংঘের মৌলিক বিষয়গুলো হারাতে বসেছি। আমাদের উৎসব, পার্বণগুলো আর আগের মত নেই। এগুলোতেও আধুনিকতার ছোয়া লেগে নতুন রূপ লাভ করেছে। তাই এভাবে আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে গিয়ে যদি জাতিসত্ত্বার মৌলিক বিষয়সমূহ হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমাদের আত্বপরিচয়ের দিক থাকল কোথায়? আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা আত্বপরিচয়ের কিবা চিহ্ন বহন করবে? বিশ্বায়নের ডামাডোলে, আধুনিক বিজ্ঞানের যাদুর স্পর্শে আমরা যদি রাতারাতি অস্তিত্বের বিস্তৃতির ইতিহাস রচনা করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ আত্বপরিচয় কী হবে? এ প্রশ্ন এবং উত্তর তোমার, আমার, আপনার এখনি সবার ভাবা উচিত।

.....

আনন্দ মিত্র চাকমা, বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষক ও সদস্য জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল।

মনোজ বাহাদুর

মঞ্চ নাটকের ডিজিটাল ধারণা

নাটক মঞ্চায়নের কথা বললেই আমার ছোট বেলার যাত্রা পালার কথা মনে পড়ে। চতুর্দিকে দর্শক মাঝখানে মঞ্চ।মঞ্চের একপাশে হারমোনিয়াম,তবলা, বিউগল ও ক্লারিওনেট ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র নিয়ে আবহ সঙ্গীত প্রদানের জন্য বাদকরা বসা। অভিনয় শিল্পীরা অনর্গল ভাবে তাদের সংলাপ বলছে। যার যার চরিত্রের বিষয়ে তাদের মধ্যে যে একাগ্রতা দেখেছি তা এখন ভাবতে অবাক লাগে। যাত্রায় সংলাপ বলার ভঙ্গিও ছিল অন্যরকম। বর্তমান সময়ের সাউন্ড বা মাইক এসব কিছু তখন ছিল না তাই যাত্রা দেখতে আসা শেষ সারির দর্শক ও যাতে শুনতে পায় সে জন্য জোর গলায় অনেকটা চিৎকার করে তাদের সংলাপ বলতে হতো। তবে মঞ্চের একপাশে অভিনীত যাত্রাপালার বই নিয়ে একজনকে সংলাপ বলার ড়্রোত্রে অভিনয় শিল্পীদের সহায়তা করার দৃশ্য ও আমি লড়্যা করেছি।

তাদের এই অভিনয়ের ধারা বছর বছর দর্শকরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত্ব হয়ে পড়েছিল। গ্রামে গঞ্জে আরো বহু ধরনের লোকজ সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল। যেমন কবিগান বা কবির লড়াই,পালাগান,পুথি পাঠ,কীর্তন ইত্যাদি। সেসব অনুষ্ঠানেও অভিনয় থাকতো। তার কারণ সাধারন শ্রোতা দর্শক যে কোন বিষয় অতি সহজভাবে বুঝতে চায়। কাহিনী বর্ননার সাথে যদি অভিনয় সংযোজন করা হয় তবে সেটি আরো বেশী সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

আধুনিক মঞ্চ নাটকের বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমি আধুনিক নাটকের গ্রামার বুঝি না। সে বিষয়ে আমার পড়া লেখাও নেই। প্রতীকি অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারি না কারন আমি একজন সাধারন দর্শক শ্রোতা। আমি আকাশ কে আকাশ দেখি, সূর্যকে সূর্য দেখি,চাঁদ কে চাঁদই দেখি। আমি কালো মেঘ দেখে কোন রমনীর ঘন কালো চুল ভাবতে পারি না। বৃষ্টির শব্দে আমি কোন রমনীর পায়ের নুপুরের আওয়াজ শুনি না। কারণ আমি আবার বলছি আমি একজন সাধারণ দর্শক শ্রোতা।

নাটক আমার ভাল লাগতো। ছোট বেলায় আমার ফিলিপস রেডিওতে গুনা তারের এন্টিনা লাগিয়ে বিকেল ৪টায় কলিকাতা খ কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শ্রুতি নাটক গুলো প্রায়ই শুনতাম। তবে নাটকের আওয়াজ আসতো ঢেউয়ের মত। রাঙ্গামাটিতে ঢাকা বেতার শোনা যেত না। চট্টগ্রাম বেতার পরিস্কার ছিল তবে নাটক প্রচারের ড়্রোত্রে তারা খুব একটা যত্নবান ছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। আর কোলকাতা খ কেন্দ্রের নাটক শোনার পেছনে কারণ ছিল,তারা সমরেশ মজুমদার, নীহারঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ উপন্যাসিকদের জনপ্রিয় কাহিনী গুলোকে নাটক বানিয়ে প্রচার করতো। আর দেশ পত্রিকার মাধ্যমে নানান লেখকের লেখাগুলো পড়ার সুযোগ ছিল। বই আকারে বেরোবার আগেই তাদের অনেক লেখা খন্ড খন্ড করে দেশ পত্রিকায় ছাপনো হতো। রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরীর মেম্বার হিসেবে প্রতি নিয়ত নূতন নূতন বই পড়ার সুযোগ ছিল। তখন বই পড়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ তখন টেলিভিশন ছিল না। গান শোনার জন্য ৭৮ স্পিডের গ্রামোফোন ছিল। আমি ক্যাসেট পেস্নয়ার কিনেছিলাম সম্ভবত ১৯৭৭ সনে।

কোলকাতার নাটকের বিশেষত্ব ছিল তারা শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে দিত নাটকের দৃশ্যটা কোথায়। যাতে শ্রোতার কাছে ঘটনাটা স্পষ্ট হয় । আমি নাটক শোনার সময় চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতাম আর নাটকের দৃশ্যটি আমি মনের পর্দায় দেখতে পেতাম। আর সে সব নাটকে যে কোন বীর,শান্তম্ব বা গম্ভীর আবহের সময় বিবেচনায় নিয়ে যথার্থ মিউজিক প্রয়োগ করা হতো। তারা নাটকের আবহ সঙ্গীতের উপর অত্যন্তম্ব যত্নবান ছিলেন। ক্যাসেট পেস্নয়ার কেনার পর ভানু বন্দোপাধ্যায়ের নানান কৌতুক, বিরাজ বৌ, শেষের কবিতা ইত্যাদি শ্রুতি নাটক সহ, নানান শিল্পীর আবৃতি শোনার সুযোগ হয়েছিল ।

ছোটবেলায় স্কুলে মাঝে মাঝে গান পরিবেশনের পাশাপাশি অভিনয় করতে হতো। আমাদের একজন বাংলা শিড়্যক ছিলেন,তিনি আমাদের দিয়ে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি আমাদের দিয়ে অভিনয় করালেন মাইকেল মধুসুধনের অমিত্রাড়্যর ছন্দের মেঘনাদ বধ কাব্যের অংশ বিশেষ। আমি হলাম মেঘনাদ। আমার সংলাপ শুরম্ন হলো " জানিনু কেমনে আসি লড়্যান পশিল রড়্যাপুরে,হায় তাত উচিত কি তব এই কাজ? ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সংলাপ আমাকে অনর্গল মুখস্তম্ব করতে হয়েছিল, তখন শিড়্যকরা কথায় কথায় বেত চালাতেন। বেতের ভয়ে

আমার মুখস্ত্ম বিদ্যার জোর বেড়ে গিয়েছিল। একই অবস্থা হয়েছিল আমার অন্যান্য সঙ্গীদেরও। আমার বাবা যাত্রা পালায় অভিনয় করতেন। বাসায় আমার বাবাকে ডায়ালগ মুখস্ত্ম করতে দেখেছি। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই এসব বিষয়ে অনুপ্রানিত হয়েছিলাম। আমার দিদি মঞ্জু রানী গুর্খা কণ্ঠ শিল্পী হলেও তিনি রাঙ্গামাটির বহু নাটকে অভিনয় করেছেন।
১৯৭৮ সনের শেষের দিকে আমি চাকুরী সুত্রে খাগড়াছড়িতে বদলী হই। খাগড়াছড়ি তখন জেলা ঘোষিত হয় নি মহকুমা ছিল। সেখানে পরিচয় হয় জনাব ইব্রাহিম খাঁ নামে একজন নাট্য ব্যক্তিত্বের সাথে। আমি মহকুমা শিল্পকলা একাডেমীর ব্যানারে তখন তার সহায়তায় খাগড়াছড়িতে নাট্য চর্চা শুরম্ন করি। একে একে মঞ্চায়ন করি কল্যাণ মিত্রের চোরা গলি মন, আশকার ইবনে শাইখ এর ফকির মজনু শ্াহ সহ আরো বহু নাটক।
আমার প্রিয়জন তারকালোক পত্রিকার সত্বাধিকারী আরেফিন বাদল তার সাইট এন্ড সাউন্ড এর প্রযোজনায় একটি সিরিজ নাটক তৈরি করেন। নাম ইমু বাবু। পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব দারা শিকো। সেই নাটকে আমি নায়িকার পিতার চরিত্রে অভিনয় করি। নাটকটি এটিএন ও বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছিল।

আমি বিটিভি হতে প্রচারিত এই সব দিন রাত্রি, সংশপ্তক ও অন্যান্য সিরিজ নাটক গুলোর জনপ্রিয়তার কারন অনুসন্ধান করে এটুকু উপলব্ধি করেছি যে নাটক গুলো সহজ ভাবে একজন সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে যাতে গ্রহণযোগ্যতা পায় ঠিক সে ভাবে বানানো হয়েছিল। তখন নাটকে যারা অভিনয় করতেন তারা চরিত্রের গভীরে যেতেন,যারা নাটক বানাতেন তারাও ধৈর্য সহকারে অভিনয় শিল্পীদের কাছ থেকে বেস্ট পারফরমেনসটি আদায় করে ছাড়তেন। এখন টিভি চ্যানেলের সংখ্যা যেমন বেড়েছে নাটকের সংখ্যা, অভিনয় শিল্পীর সংখ্যা ও বেড়েছে,তার সাথে সাথে বেড়েছে পরিচালকের সংখ্যা । শোনা যায় অনেক পরিচালক একশন, রোল এ দুটি শব্দ ছাড়া আর তেমন কিছু করেন না । অভিনয় শিল্পীর অভিনয় শুধরে দেয়ার মত বা অভিনয়টি কি ভাবে করতে হবে সেটি যদি পরিচালক দেখিয়ে দিতে না পারে তবে ভালো নাটক কি ভাবে বানানো সম্ভব। আবার এ ও শুনেছি যে অনেক নাটকের নাকি স্ক্রিপ্ট বা কোন কাহিনী থাকে না। নাটক বানানোর সময় নাকি সহ শিল্পীদের পরামর্শে কাহিনী তৈরি হয় ও উপস্থিত ভাবে নাটক শুট করা হয়। জানি না আমার শোনাটা সঠিক কিনা।

আমি গত কিছুদিন আগে কবি গুরম্ন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা ও জাতীয় কবি কাজী নজরম্নল ইসলামের অগ্নিগিরি নাটক দুটি রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে মঞ্চস্থ করেছিলাম। আমি প্রথমে নাটকের সংলাপ গুলো মঞ্চে অভিনয়কারী শিল্পীদের মঞ্চে প্রবেশ ও বের হওয়ার টাইমিং মিলিয়ে রেকর্ড করি। সেই রেকডিং ট্রাকের সাথে সিকোয়েন্স অনুসারে মিউজিক সংযোজন করি। সেই ট্রাক বাজিয়ে আমি অভিনয় শিল্পীদের মহড়া করাই। এর ফলে নাটকের সংলাপ ও আবহ সঙ্গীতের এডিট করা সম্মন্বিত সাউন্ড দর্শকদের ভালো লাগে তারা কিছুটা সিনেমা দেখার আমেজে নাটক উপভোগ করে তাছাড়া দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যে

বিরক্তিকর বিরতি থাকে সেটি মিউজিক দিয়ে আমি মিলিয়ে দেই। ফলে নাটক টি বিরতি ছাড়া শেষ হয়। সাধারণ দর্শক শ্রোতা মন্ত্র মুগ্ধের মত সেই নাটক দুটি উপভোগ করে এবং অনেকে ইমোশনাল হয়ে যায়। সেটি আমি বুঝতে পারি কারণ নাটক শেষ হওয়ার পর ২/১ জন সিনিয়র জন আমার সেই ডিজিটাল নাটকের উচ্ছসিত ও আবেগপ্রসুত ভঙ্গিতে প্রশংসা করেন। আমি লক্ষ্য করি যে হলের সাধারণ দর্শক শ্রোতারা আমার নাটকের বিশেষ বিশেষ মুহুর্তে তুমুল করতালি দিয়ে ও বিভিন্ন মন্তব্য, এমনকি চিৎকার করে নাটকের পজিটিভ চরিত্রের পড়্গা নেয় ও নেগেটিভ চরিত্রকে গালমন্দ করে। আমি বিষয়টি বেশ এনজয় করি। দর্শক শ্রোতাদের আমি সিনেমার স্বাদ দিতে পেরেছিলাম বলেই হয়তো এটি সম্ভব হয়েছিল।

সাধারণ মঞ্চ নাটকের দর্শক প্রিয়তা হারানোর অনেক গুলো কারণ আছে। কারণ গুলো বর্ণনা করার আগে একটি বাস্ত্মব ঘটনা বলি। ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীর "স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলড়্গে আয়োজিত নাট্য মঞ্চায়নের" কর্মসূচির আওতায় সম্ভবত গত বছর ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমীর নব নির্মিত নাট্য মঞ্চে ৭তলায় রাঙ্গামাটির নাট্য দল নিয়ে নাটক মঞ্চায়ন করি। সেখানে দর্শক শ্রোতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমাদের দর্শকরা ছিলেন, যারা আমাদের পরে নাটক করবেন সেই নাট্য দলের সদস্যরা। আমদের নাটক শেষ হতেই তারা আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যাতে তাদের নাটকের সময় দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকি। আমি জানি না ঢাকার অন্যান্য মঞ্চে নাটকের সময় এ ধরনের হয় কি না? যা হোক বিষয়টি আমাদের জন্য বেদনা দায়ক। দিনের পর দিন মাসের পর মাস রিহার্সাল করে, মগজ খাটিয়ে শারিরীক পরিশ্রম দিয়ে বানানো নাটক মঞ্চায়নের সময় যদি দর্শক না থাকে তখন মন ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক।

মঞ্চ নাটকের সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। বর্তমান আকাশ সংস্কৃতি, গেস্নাবাল ভিলেজের যুগে টিকে থাকার জন্য সকলেই নূতন নূতন উপায় খুজে নিচ্ছে। সিনেমা,যাত্রা যেমন টিকে থাকছে না, মঞ্চ নাটকের অবস্থা ও তাই। টিকে থাকার জন্য এখনই কৌশল খুজতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতির নানা সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সারা বিশ্বে মঞ্চের অনুষ্ঠান গুলোকে কিভাবে দর্শকদের মাঝে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটি আমার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। সারা দিনই বিভিন্ন ডিশ চ্যানেলগুলো এসব ডিজিটালি নির্মিত মঞ্চ অনুষ্ঠান গুলো প্রচার করে যাচ্ছে। আমরা কেন বোকার মত পুরাতন ধ্যান ধারণার ধুয়ো তুলে পিছিয়ে থাকবো । এতে কি কোন লাভ হবে ? নিশ্চয় নয় । প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে আমরা এক সময় হারিয়ে যাবো।

সংলাপ রেকর্ড করা আমাদের সেই নাটকটির একটি প্রদর্শন হয় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমী উন্মুক্ত মঞ্চে। আমাদের নাটকের আগে অন্য একটি নাট্যদল নাটক উপস্থাপন করে। স্বাভাবিকভাবেই মঞ্চের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়া মাইক্রোফোন গুলোতে অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ বলার শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দর্শকদের কানে আসে, যিনি মাইক্রোফোনের কাছে থাকেন

তার শব্দ হয় জোরে আর অনেকের ডায়লগ শোনাই যায় না। আর রাইফেল নিয়ে যিনি গুলি করার অভিনয় করছেন তার গুলির শব্দ আসলো অনেক পরে। দর্শকরা এত অসামঞ্জস্য কত আর সহ্য করবেন । আগে যেমন বাংলাদেশে একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল তখন টিভি কর্তৃপক্ষ যা দেখাতো তাই বাধ্য হয়ে দেখতে হতো। এখন কি সেই সময় আছে? এখন রিমোটের এক টিপে পছন্দের চ্যানেলে আমরা ঢুকে যাচ্ছি। যে চ্যানেল ভালো সেই চ্যানেল জনপ্রিয় হচ্ছে। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই সময়ের চাহিদা পূরণ করতেই হবে। আমি অনেক বিজ্ঞ জনকে দেখেছি মঞ্চ নাটক দেখতে না আসা আমার মত সাধারণ দর্শকদের গালি দিতে। আমি অনুরোধ করবো গালি না দিয়ে আসুন কিভাবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে গেন্নাবালি পছন্দের পদ্ধতিতে পরিবেশনের মাধ্যমে নাটককে দর্শকপ্রিয় করার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারি সেই চেষ্টা করি।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সকলেই দৌড়াচ্ছে। আমরা কি করবো সেটি ভেবে দেখার বিষয়। যা হোক এর পরে আমাদের ডিজিটাল নাটক মঞ্চায়ন হলো এডিটকরা, প্রসেস করা, ডায়লগ, উচ্চমানের আবহ সঙ্গীত, সাথে আমাদের অভিনয় শিল্পীদের নিখুত লিপ্সিং এবং বিরতিহীন উপস্থাপনা। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত আমাদের নাটক উপভোগ করলো । তারা কেউই বুঝতে পারলো যে এটি ডিজিটালি করা। কিন্তু পুরাতন ধ্যান ধারনার কিছু তথাকথিত নাট্য ব্যক্তিত্ব এই বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারলেন না। তারা বললেন এটি মঞ্চ নাটকের ফর্মুলার মধ্যে পড়ে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা পরিবর্তনকে ভয় পান। কিন্তু সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে আমাদের নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। তবে তথাকথিত নিয়মের কথা বলে আমরা আমাদের ডিজিটাল নাটকটি ঢাকায় আমাদের মত করে মঞ্চায়ন করতে পারিনি।

আমার প্রশ্ন ? আমি নাটক বানাবো কার জন্য। নিশ্চয় আমার টার্গেট হবে সাধারণ দর্শক। সাধারণ দর্শক যদি আমার নাটক পছন্দ করে তবে অবশ্যই আমি স্বার্থকতার দাবীদার। আমি মনে করি কোন নিয়মের বেড়াজালে বন্দী হয়ে যা কিছুই হোক কিন্তু সংস্কৃতি করা যাবে না। সৃষ্টিশীল মনের ভাবনা,চিন্তা কোন রীতি নীতির তোয়াক্কা করে না। দশ ঠাটের বেড়াজাল ভেঙেও অনেক বেনামী রাগ, সুর,গান সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন স্কুল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া করলে তিনি বিশ্বকবি হতে পারতেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আমাদের লোকজ সঙ্গীতের ভান্ডার নিশ্চয় রাগ রাগিনীর সুত্র ধরে সৃষ্টি হয়নি। আজ যেটি সত্যি সেটি কাল মিথ্যা হতে পারে। সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য এবং পৃথিবীসহ সকল গ্রহ এই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এই সত্যি আবিস্কার করার জন্য গ্যালিলিও কে জীবন দিতে হয়েছিল। কারণ তখন সকলেই জানতো যে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র।

আমার ডিজিটাল ধারনা কে যারা সমালোচনা করেন আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আগে তো পেট্রোম্যাক্স অর্থাৎ মেন্টল লাইট জ্বালিয়ে নাটক বা যাত্রা পালা হতো এখন আধুনিক প্রযুক্তির লাইট কেন ব্যাবহার করছেন। আগে একটি মঞ্চে নাটক হতো এখন রিভলভিং পস্নাটফর্মে একের অধিক মঞ্চ কেন ব্যবহার হচ্ছে। মঞ্চ নাটকে মিউজিকের ক্ষেত্রে লাইভ কেন বাজানো হচ্ছে না, কেন মিউজিক ট্রাক ব্যবহার করছেন?

যারা নাটকের তথাকথিত নিয়মের বেড়াজাল ভাঙতে চান না তাদের কাছে আমার অনুরোধ অন্তত নাটকের সংলাপ যাতে উচ্চকণ্ঠে (মঞ্চ নাটকে উচ্চ কণ্ঠে সংলাপ বলতে হয়) না বলে আবেগের সাথে, রাগের সাথে, যথোপযুক্ত টোনে বলা যায় ও মঞ্চ নাটকে অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ সুস্পষ্ট ভাবে যাতে শোনা যায় সে জন্য এক নুতন পদ্ধতির কথা আমি শুনেছি। সেটি হচ্ছে অত্যাধুনিক সাউন্ড টেকনোলজির ওয়ারলেস মাইক্রোফোন। প্রতি শিল্পীর বুকে মুখের কাছে ছোট্ট মাইক্রোফোন লাগিয়ে নাটকের মান বাড়ানো যেতে পারে। তবে আমরা যারা মফস্বলে থাকি তাদের জন্য এটি ব্যয়বহুল। তবে এই ব্যবস্থায় নাটক উপস্থাপিত হলে নাটকের মান ও জনপ্রিয়তা পুনঃবৃদ্ধি পাবে আর তথাকথিত নিয়ম কানুনও ভঙ্গ হবেনা বলে আমার বিশ্বাস।

.....

মনোজ বাহাদুর গুর্খা, সভাপতি সুর নিকেতন, বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, রাঙামাটি।

অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা

তুচ্ছ বর্ণভেদ

সুজন ছোট্ট শহর কাপ্তাই উপজেলায় একটা বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী করেন। এলাকার পরিচিত জনের বাসায় লজিং থাকেন। ঘন ঘন বন্ধ থাকায় অফিসের কাজ অনেক পড়ে আছে তাই বস্ দু'দিন সরকারী বন্ধে কাজ করতে অনুরোধ করেছেন । সেজন্য বন্ধ হওয়া সত্বেও বৃহস্পতিবার বিকেলে অন্যান্যদের মতো জেলা শহরের উদ্যেশ্যে রওনা হতে পারলেন না। ছোট চাকরী ; টানাপোড়নের সংসার। আশা ছিল মাসের বাজার ছেড়ে দিয়ে আসবেন ; কিন্তু তা হলোনা।

বেশ কিছু দিন ধরে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা চলে আসছিল। খুব ভোরে অফিসে এসে কিছু জরুরী কাজ ছাড়েন সুজন। ঘন্টা খানেক হাঁটার পর ট্রাংক রোডের পার্শ্বের ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে এসে চা কাপে চুমো দিতে দূর থেকে শুনতে পেলেন - কারা যেন শেস্নাগান দিতে দিতে উপজেলা কমপেস্নক্সের দিকে এঁগুচ্ছে। দোকানীর কাছ থেকে জানা গেল গত রাতে কারা যেন চট্টগ্রাম-কাপ্তাই ট্রাংক রোডের উপরে হায়াত নামের এক লোককে মেরে ফেলে চলে গেছে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই এ প্রসেশন বলে দোকানী জানায়। দেখতে দেখতে জনা ত্রিশেক

যুবক রাস্ত্মার তে-মাথায় এসে বক্তৃতা দিতে থাকে। দূর থেকে সুজন দেখেন সেখানে দেখতে দেখতে লোক সমাগম বাড়ছে। ছুটির দিন বিধায় এতক্ষণ রাস্ত্মাঘাট ফাঁকা ছিল।

সুজন অবস্থা বুঝে উপজেলা অফিসের দিকে গিয়ে অফিসে পুনঃকাজে যোগ দেন ; কিন্তু অদূরে মাইকের হট্টগোলের কারণে তিনি কাজে মনোযোগী হতে পারছিলেন না , তাই কিছুক্ষণ পর অফিসের দো-তালার বারান্দায় এসে উঁকি দিয়ে ঘঁটনার বিষয় জানতে চেষ্টা করেন। এক সময় এ মিছিল ও জনতা জঙ্গীরূপ নেয়। এদিক সেদিক লোক ছুটা ছুটি করতে থাকে। পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিষয়টা জানতে চেষ্টা করেন সুজন। ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কিছুটা উদ্বিগ্ন হলেন তিনি। বিষয়টা ছিল বর্ণবাদ সংক্রান্ত্ম। আর দেরী না করে নিরাপত্তা আশ্রয়ের খোঁজে স্টাফ কোয়াটার সংলগ্ন জঙ্গলে সুজন দেন ছুট। জঙ্গলের আশে পাশে কোন লোকের সাড়াশব্দ নেই ; দূরে রাস্ত্মার মোড়ে হট্টগোল , আত্ম চিৎকার, কান্নাকাটি আর আহাজারি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছেন তিনি। আরও ভীত হয়ে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেন সুজন। হাফাতে হাফাতে বসে পড়েন তিনি।

" আঃ ! আর হাঁটতে পারছিনে - বুক ধরফর করছে " ; বুক ফেটে যায় যায় অবস্থা। দিনটা যদিও শীতের সকাল তথাপি তৃষ্ণার্থ মনে হচ্ছিল নিজের কাছে ; গলা একদম শুকিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বসার পর নিজেকে প্রবোধ দেন- " যাক অনেক দূর এসে গেছি ; আমি অনেকটা নিরাপদ।" দূর থেকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে নীচের রাস্ত্মার লোকদের দৌঁড়াদৌড়ি , মারামারি , লাঠা লাঠি চলছে দেখে বুক আরও জোড়ে ধরফর ধরফর করতে থাকে সুজনের। অবস্থা দেখে তিনি নিজেকে সেখানেও নিরাপদ মনে করলেন না ;- " ভাবলেন দূরে যেতে হবে আরও দূরে গভীর জঙ্গলে , যদ্দুর যাওয়া যায়।" অনেক ছড়া , পাহাড় পর্বত পার হয়ে তিনি গভীর জঙ্গলে এসে হাজির হন। সেখানে এসেও আশে পাশে কিছু জঙ্গলের ঝনঝনানি শুনতে পান তিনি। কিছুটা সন্ত্রস্ত্ম হলেন প্রথমে। কিন্তু না , তারাও ভীত সন্ত্রস্ত্ম মানুষ ! - নিরাপদ আশ্রয়ের খোজে গিয়েছে।

সুজন দেখতে পান পরিচিত এক বড়ুয়া ছেলে, পরিচিত এক মার্মা দম্পতি, অপরিচিত বোরকা পরিহিতা মধ্য বয়সের এক নারী। সঙ্গে সম্ভবতঃ ষোড়শী কন্যা। সকলেই ক্লান্ত ; কারোর হাতে-পায়ে ঘা, কারোর মুখে ও গালে আঁচড় লাগায় কিছু কিছু রক্ত ঝড়ছে। বেশী রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল ষোড়শী মুসলিম কন্যার পা থেকে। এ বিপদ সংকুল মুহূর্তে সকলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতির ভাব অনুভব করল।

একের প্রতি অন্য জনের কোন বিদ্বেষ ভাবটুকুন দেখা গেলনা। সুজন গুটিকয়েক আসাম পাতা হাতে নিয়ে কচলিয়ে মেয়েটার পায়ে লাগায় আর বড়ুয়া ছেলেটা তাৎক্ষণিক নিজের পরিহিত লুঙ্গির এক কোনা ছিঁড়ে নিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম স্নেহমাখা হাতে বোনের পায়ে বেঁধে দেয় নিঃসংকোচে। অন্যদের কাছে মনে হল- কনিষ্ঠ বোনের প্রতি বিপদ সংকুল মুহূর্তে যেন বড়

ভাইটি দায়িত্ব পালন করছে। এভাবে কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরকে শূশ্রূষা করলো তারা। ক্লান্ত্ম বোরকা পরিহিতা মাকে মাঝবয়সী মার্মা দম্পতি সেগুনের পাতা দিয়ে পাখা করতে থাকে। অনেকক্ষণ থাকার পর একে অন্যের প্রতি করম্নণ ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে।

সুজনের বুক কাঁপতে থাকে। গরম আর তৃষ্ণায় ছট্ পট্ করতে করতে এক সময় সুজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানায় উঠে বসেন সুজন। বেড সাইড থেকে পানির গস্নাস নেন। পান করার পর আবার বিছানায় শুয়ে পড়েন তিনি , আর ভাবতে থাকেন - " এ কি বিভৎস ঘটনা ! বাস্ত্মব ঘটনা না কি স্বপ্ন ? এ কেমনই বা স্বপ্ন ?" এ বিষয় নিয়ে সুজন ভাবতে থাকেন - " এক শৈশব কাল আর এক বিপদকালে মানুষের জাত-বিজাত, স্বধর্মী-বিধর্মী কিছুই ভেদাভেদ থাকেনা ; বিপদগ্রস্থ মানুষের প্রতি অপর মানুষের শত্রম্ন-মিত্র বেধা-বেধের কোন অবকাশ থাকেনা বরং জরম্নরীকালে মানুষ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত আপনা আপনিই বাড়ায় এবং বাড়াতে ইচ্ছে করে ; যা সৃষ্টিকর্তাই এ সুযোগ করে দিয়ে মানুষদের অহিংসানীতি শিক্ষা দেয় । সুজন ভাবে - এ স্বপ্ন ইহাই শিক্ষা দেয় - " কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙ্গা "। এ পৃথিবীতে মিশেমিশি জাত , কাল , পাত্র ভুলে বলতে ইচ্ছে করে " তুচ্ছ বর্ণভেদ "।

.....

অজিত কুমার তন্চংগ্যা , বিশিষ্ট সাহিত্যিক , রাঙামাটি।

ন' কৈয়া কধা

কবিত্যেয় ন' কৈয়া কধা

মুকুন্দ চাঙমা

১

মা পিত্তিমি জননী মর, তা বুগত জাগাদিনায়
মানেই কুলত জন্ম দিয়্যে মরে।
তার মাদি পানি, আলো-হাভায় বাচি থেই
মানেইর দুগ-সুগ আনন্দ বেদনায় গাধি বুর পাড়ি
ফেলেই এলুঙ জীবনর পচাশিবুয় জন্মদিন মর।
দ্বি চোগ ভরি দেগি এলুঙ ঋতু চাক্কা বদলর
পিত্তিমির নানা রূপ, নানা রঙ, নানা সাজ তার।
বিন্যা পূগ' আগাজত রাঙা চিকচিক্যা বেলর সোনারঙ রোদর ছদক,
পুন্নিমা রেইদত পুতপুত্যা জুন' পহরত চান মুআনর পহ্ন হাসি,
রেদ' আগাজত ঝিমিত ঝিমিত তারাউনর চোগ তেবত তেবত।

২

কিছু কম শতাব্দীর জীবন কালত
পিত্তিমির যুগ বদলর নানা ঘটনা,

নানা আবিস্কার গুধি যিয়্যে ম' চোগ'ত্তলে।
মুই লাগত পেয়্যঙ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ,
আনবিক বোমার ভয়ংকর ধ্বংস লীলা !
আগাত্যা বুদুম হ্লাগ পর' রাজ্য গিলিয়া
উপনিবেশিক ইউরোপীয় সামরাজ্যবাদী পরাশক্তি উন !
এশিয়া আ কালা আফ্রিকার পরাধীন দেশ জাতিউনে
এগে এগে পেই গেলাগ মুক্তি আ স্বাধীনতা।
দেইক্যঙ, ব্রিটিশ ভারত ভাগ মৈ নেই
হিন্দু মুসলমানরলস্নায় ভারত পাকিস্ত্মানর জন্ম।
দেশ ভাগর মানেইউনর কি দুরগতি আর সিচ্চত !
গণতন্ত্র বিশ্বর পরাশক্তি হিসেবে বিশ্ব নাচ সালাত
উদি এল' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।
শুরম্ন হ্ল' কূটনৈতিক স্নায়ু যুদ্ধ
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার।
সমাজতন্ত্র কায়েম গরিলাক মাওসেতুঙর মহাচীন,
ফিডেল ক্যাস্ট্রোর দ্বীপ রাষ্ট্র কিউবা।
মহাশূন্য গবেষণার বিরাট সাফল্য;
উপগ্রহ চানত লামি বেড়েই এল' নীল আর্মস্ত্রং।
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনত্তুন আরম্ভ গরি
একাত্তরর মুক্তি যুদ্ধত পাকিস্ত্মানরে হ্দেই দি,
পিত্তিমির বুগত দেঘা দিল' বাংলাদেশ নাঙর এক্কান নুআ রাষ্ট্র।
পিত্তিমিরে আমগ গুরি সোভিয়েত ইউনিয়ন বুদুম মৈ
ভাঙি গেল' হদ্দা হদ্দা গরি।
পিত্তিমিত এই গেল গণতন্ত্রর আধিপত্য।
ধনতন্ত্র বিশ্বর অহঙকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার
জ্বলিপুরি ধুলিসাৎ।
ম' লাগদ পেয়্যা এঈ সব ঘটনায়
পিত্তিমির বুগত চলি এজের ধারা দিগাল্যা রাজনীতির খেলা।
৩
জাগা জমি, খনি, কলকারখানা উৎপন্নর সব হাত্তের
রাষ্ট্রই একমাত্র মালিকদার;
খানা, থানা, শিঘানা, গাউলি গম' রাগানা
মানেইয়র মূল এই চের অধিকার
রড়্গা গরিবার দায়িত্ব লয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ব্যক্তি সম্পত্তি ন' রাগায়,
রাষ্ট্র চালায় এক্য দলে, ---- সাম্যবাদী দল।
ঝাক্কো রাজনৈতিক দল মানি নেযায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র,
ব্যক্তি স্বাধীনতারে গুরম্নত্ব দেয়,
ব্যক্তি সম্পত্তিরে সমর্ত্তন গরে,
রাষ্ট্র সম্পত্তির পাহারাদার মাত্র।
ব্যক্তি সম্পত্তি শ্রেণী ভাগ গরে সমাজর মানুষ্যনরে
উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বিত্তহীন।
শ্রেণী ভাগ সমাজর যার যদক বিত্ত
সেধক তার ভোগর অধিকার।
বিত্তহীনর ভোগর কোন অধিকার নেই,
ভোট দানর অধিকার ছাড়া।
উচ্চবিত্ত ধনীউনে বেগ ভাগ সম্পত্তির মালিক, সংখ্যা তারা কম।
উৎপাদনর কর্মকান্ডলোই অন্যউনরে শোষন গরন তারা।
গণতন্ত্র নাঙ হ্লে অ রাষ্ট্র চালান ধনীউনে
ধনীর স্বার্থ রড়্গা গরন তারা
ধন'তন্ত্রই ঠিক নাঙ তার।
৪
গণতন্ত্র নাঙর রাষ্ট্রআনিঅ' আগে শ্রেণী ভাগ;
উন্নত রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, অনুন্নত রাষ্ট্র।
অনুন্নত গরীব দেশশানিরে ভালেদী নাঙে
সাহায্য গরে ধনী দেশশানিয়ে।
সাহায্য শর্তআনির ভিধিরে পরোড়্গাভাবে
শোষণ গরে গরীব দেশশানিরে তারা।
গরীব দেশর প্রাকৃতিক সম্পদর উপর
ভারি লোভ ধনী দেশশানির।
কূটনীতির চক্রান্ত্ম গুরি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
ঘটায় সেই সব দেশশানিরে।
পিথিমি ব্যাপী ধনী দেশ্চানির আধিপত্য!
অঝা বান্দর আমেরিকা।
৫
লুভ, লাভ আর ভোগ ধনতন্ত্রর মূল কধা;
অত্তালিয়া ধন সম্পত্তি খেই ন ফুরিয়া
বিলাস ব্যাসন, সম্পদর অপচয়।

অন্য কিদ্যাদি ঘর' নেইয়া খেই ন' পেইয়া মানুষ্যনুর
পধে পধে ভিখ মাগানা।
বেগ ভাগ গণতান্ত্রিক দেশশানির
এই হ্লদে সমাজ চিত্র।
অগুন্ত্মি গাড়ি আর কলকারখানার ধুমা আধঙ-কাজর
পিথিমির বুয়ার, দেবা, মাদি পানি বিষে ভরি যার।
লোভী ধনীউনে লাভলস্নায় পিথিমির বন ধ্বংস গত্তন,
উজার গুরি তুল'ধন মাদিতলর খনিজ সম্পদ।
প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট ত্মৈ জারগ্যেয়।
ঘনঘন বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সুনামি, ভূজোল
ইক্কে নানা দেশর নিত্য দিনর ঘটনা।
পিত্তিমির গরম বাড়ানায়
মেরন্ন অঞ্চলর বরফ গলি যার
দজ্যার পানিবারি যারগোয়
বিজ্ঞানীউনে অনুমান গত্তন-
কয় বছর পরে ডুবি যেব'গৈ নেদারল্যান্ড, মালদ্বীপ
বাংলাদেশর দগিন ভাগ সুদ্ধ আর'অন্য দ্বীপ রাষ্ট্র।
অসহায় হবাক অনেক দেজর মানুষ।
থুঅ ধরিত্রী সম্মেলনর নীতিমালা
বেক্কানি মান' দে রাজি ন'হ্ন
শিল্পোন্নত বিশ্বর ধনী রাষ্ট্র উনে।
৬
অজল চুগত উদি যিয়্যে ইক্কে মানেইয়র সভ্যতা।
বিজ্ঞানর পত্তি পদে পদে চের হিত্যোদি জয় জগার,
আনবিক মহাশক্তিরে কামত লাগেই
বিজ্ঞানীউনে গুরি যাধন অসাধ্য সাধন।
খবর বিলানার যন্ত্র কারিগরির অসম্ভব উন্নয়ন-
ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল
পিত্তিমিয়ান কায় এত্তে এত্তে
ইক্কে মুঠোর বিতর এস্যে,
পিত্তিমিয়ান হ্মা নয় ইক্কে বিশ্ব আদাম।
যন্ত্র মানব রোবট মানেইয়র ভেগ কাম গরে;
ঝুকি বলা খনির ভিতরে রোবট কাম গরে,
মাদি মুরত্তুন তুলি আনের লুগিটিয়া সম্পদ,

মহাশূন্যর নভোযানর ভিধেরেত্তুন
রোবট নিয়মিত হ্বর পাধায় পিত্তিমিত।
বানা যন্ত্র পরান নয়-
খোদার উপর খোদগিরিগুরি
রক্ত মাঙসর আসল পরা'ন বানে পারে বিজ্ঞানীউনে (ক্লোন পদ্ধতি)।
নিত্য বাড়ি জানা, মানেই উনরে খেবার জোগান দের'
কৃষি বিজ্ঞান-হাইব্রীড ফসল নিগেলেই।
রোগ ব্যাধি অপুষ্টিত্তুন রড়্গা গুরি
মানেইয়র আয়ু বাড়ে দিয়্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান।
মৃত্যুহীন জীবনর সাধনা গত্তন বিজ্ঞানীউনে।
৭
বিজ্ঞান মানেউনরে আনিদিয়্যে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধি।
কিয়ার বল ন ঝরেয়ে গুরি পিত্তিমির মানুষ্যনরে
বাঝে রাগে পারে আধুনিক বিজ্ঞান।
ধনতন্ত্র রড়্গার স্বার্থে সিয়ান অধ ন' চায়
শিল্প উন্নত বিশ্বর ধনী রাষ্ট্রউনে।
বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদর স্বপ্ন দেইক্খে
উনিশ শতকর সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস।
বিশ্ব বিবেক সোচ্চার হ্লে
একুশ শতকেই সম্ভব হ্ব'
বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ কায়েম গরানা পিত্তিমি বুগত।
বিশ্বগ্রাম পিত্তিমিয়ান সেক্কে হ্ব বিশ্ব পরিবার!
৮
প্রাণী কুলর সেরা জীব মানে'ই জন্ম ত্মৈ ধন্য অয়্যঙ মুই
হোচপাঙ, বুগ ভরি যায় যদি দেগঙ
মেইয়া দয়্যা, সেবা যত্ন, শ্রদ্ধা সম্মান
মানেইয়র পর' ভালেদি কাম
গম ন' লাগে, মন আঙি যায়
লোভ, হীনস্বার্থ, হিঙসা পিযুম রেশারেশি হানাহানি
মেইয়ে সারা অ' মানুষ্যর কারবার।
হোচপাঙ তু'অ মুই মানেই জাত্তুরে
শুভ বুদ্ধি আবুজিব' এই ভরসায়
মানেইয়র জয় গান গাঙ।

অব্যক্ত

১

মা পৃথিবী আমার জননী, তার বুকে স্থান দিয়ে
মানবকুলে দিয়েছে আমার জন্ম ।
তার মাটি পানি, আলো হাওয়ায় বেঁচে
মানবের দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনায়
অবগাহন করে ফেলে এলাম
আমার জীবনের পঁচাশিটি জন্মদিন।
দুই চোখ ভরে দেখেছি পৃথিবীর ঋতুচক্র বদলের
নানা রূপ, নানা রঙ, নানা সাজ তার।
সকাল বেলার পূর্ব আকাশের চিকচিকে রাঙা সূর্যের
সোনালী রঙের রোদের ঝলক,
পূর্ণিমা রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চাঁদ মুখের নির্মল হাসি,
রাতের আকাশে ঝিকিমিকি তারাদের চোখ-নাচানো ইশারা ।

২

কিঞ্চিৎন্যূনে শতবর্ষ জীবন সময়ে
পৃথিবীর যুগ বদলানো নানা ঘটনা,
নানা আবিস্কার ঘটে গেছে আমার চোখের সামনে।
প্রথম জীবনে আমি নাগাল পেয়েছি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ,
প্রত্যেড়্গা করেছি আনবিক বোমার ভয়ঙ্কর ধ্বংস লীলা !
কঠিন পতন হলো পর রাজ্য গ্রাসী
উপনিবেশিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি দল।
এশিয়া আর কৃষ্ণ আফ্রিকার পরাধীন দেশজাতি সমূহ
একে একে পেয়ে গেল মুক্তি আর স্বাধীনতা।
দেখেছি, ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে
হিন্দু মুসলমানের জন্য জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্ত্মান।
দেশ বিভাগের ফলে মানুষ জনদের
কি অসহায় নিদারম্নন দূর্গতি!
শক্তির পালা বদলে গণতন্ত্র বিশ্বের নাট্য মঞ্চে
দেখা দিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।
শুরম্ন হলো কূটনৈতিক স্নায়ু যুদ্ধ,
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার।
সমাজতন্ত্র কায়েম হলো মাও সেতুং এর মহাচীনে

আর ফিডেল ক্যাস্ট্রোর দ্বীপ রাষ্ট্র কিউবায়।
মহাশূন্য গবেষণায় বিরাট সাফল্য,
উপগ্রহ চাঁদে নেমে হেঁটে এলেন নীল আর্মস্ট্রং।
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্ত্মানকে হটিয়ে দিয়ে
পৃথিবীর বুকে দেখা দিল বাংলাদেশ নামের এক নতুন রাষ্ট্র।
পৃথিবীকে অবাক করে হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন
টুকরো টুকরো হয়ে গেল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া
পৃথিবীতে এসে গেল ধনতন্ত্রের জয় জয়কার।
ধনতন্ত্র বিশ্বের অহংকার ওর্য়াল্ড ট্রেড সেন্টার
ধুলিসাৎ হলো জ্বলেপুড়ে।
আমার জীবনে নাগাল পাওয়া এই সব ঘটনা
পৃথিবীতে চলে আসছে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ।

৩

জমি-জমা, খনি, কলকারখানা উৎপাদনের যত হাতিয়ার
রাষ্ট্রই একমাত্র মালিকদার;
খাদ্য, বাসস্থান, শিড়্গা ও চিকিৎসা
মানুষের মৌলিক চারি অধিকার
রড়্গা করার দায়িত্ব নেয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
ব্যক্তি সম্পত্তি স্বীকার করে না,
রাষ্ট্র চালাই একক দল-সাম্যবাদী দল।
বহু রাজনৈতিক দল স্বীকার করে গণতান্ত্রিক সরকার,
ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গুরম্নত্ব দেয়
ব্যক্তি সম্পত্তিকে সমর্থন করে,
রাষ্ট্রই সম্পত্তির পাহারাদার মাত্র।
ব্যক্তি সম্পত্তি সমাজের মানুষদের শ্রেণী ভাগ করে-
উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন।
শ্রেণী বিভক্ত সমাজের যার যত বিত্ত
ভোগের অধিকার তার তত বেশি।
বিত্তহীনের নেই ভোগের অধিকার, অধিকার মাত্র ভোটের
উচ্চবিত্ত ধনীরা অধিকাংশ সম্পত্তির মালিক, সংখ্যায় তারা কম।
উৎপাদানের কর্মকান্ডের মাধ্যমে অন্যদেরকে শোষণ করে তারা
নামে গণতন্ত্র হলেও রাষ্ট্র চালায় ধনীরা ধনীদের স্বার্থই রড়্গা করে তারা
গণতন্ত্র না বলে ‘ধনতন্ত্রই’ বলাই সংগত হয় এই রাষ্ট্র।

৪
গণতন্ত্র নামের রাষ্ট্রগুলিও আছে শ্রেণী ভাগ-
উন্নত রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, অনুন্নত রাষ্ট্র।
অনুন্নত গরীব দেশগুলিকে উন্নয়নে
সাহায্য করে ধনী দেশগুলি।
সাহায্যের শর্তগুলির মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে
গরীব দেশগুলিকে শোষণ করে তারা।
গরীব দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের উপর
অসম্ভব লোভ ধনী দেশগুলি
কূটনৈতিক চক্রান্ত চালিয়ে রাজনৈতিক
পট পরিবর্তন ঘটায় সেই সব দেশগুলির
পৃথিবী ব্যাপী ধনী দেশগুলির আধিপত্য!
নটের গুরূ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।
৫
লোভ, লাভ, ভোগ-ধনতন্ত্রের মূল কথা;
অঢেল ধনসম্পত্তি, ভোগাতিরিক্ত
বিলাস ব্যসন, সম্পদের অপচয়!
অন্য দিকে গৃহহীন অভুক্ত নরনারীদের
পথে পথে ভিক্ষা করা
অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে
এই হলো সমাজ চিত্র।
অগনিত গাড়ি আর কলকারখানার ধোঁয়া,
আবর্জনা বর্জ্যে পৃথিবীর আকাশ বাতাস
মাটি ও পানি বিষে ভরে যাচ্ছে!
লোভী ধনীরা লাভের জন্য নির্বিচারে ধ্বংস করছে বন,
নিঃশেষে উত্তোলন করছে মাটির নিচে খনিজ সম্পদ
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য
ঘনঘন বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প
এখনকার পৃথিবীর নানা দেশের নিত্য দিনের ঘটনা।
পৃথিবী গরম বাড়ায় মেরূ অঞ্চলে বরফ গলে
মহা সমুদ্রের জল যাচ্ছে বেড়ে।
বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন-
কয় বছর পরে ডুবে যাবে নেদারল্যান্ড,
মালদ্বীপ, বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশসহ অন্য দ্বীপ রাষ্ট্র।

অসহায় হয়ে পড়বে অনেক দেশের মানুষ।
তবুও ধরিত্রী সম্মেলনের সব নীতিমালাগুলো
মানতে রাজি নয় শিল্পোন্নত বিশ্বের ধনীরাষ্ট্রগুলো।
৬
উচ্চ চূড়ায় উঠে গেছে এখন মানব সভ্যতা
বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় চারিদিকে জয়জয়কার
আণবিক মহাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে
বিজ্ঞানীরা করছেন অসাধ্য সাধন।
তথ্য সম্প্রসারণ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন;
ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল
পৃথিবীকে ক্রমশ কাছে টেনে এনে এখন হাতের মুঠোয়
পৃথিবী এখন আর বড় নয় বিশ্ব গ্রাম মাত্র।
যন্ত্র মানব রোবট এখন মানবের সব কাজ করে।
ঝুঁকিপূর্ণ খনির ভিতরে কাজ করে রোবট,
তুলে আনে মাটির তলায় লুকানো সম্পদ;
মহাশূন্যের নভোযানের ভিতর থেকে পৃথিবীতে
নিয়মিত খবর পাঠায় রোবট।
শুধু যন্ত্র মানব নয় খোদার উপর খোদগিরি করে
রক্ত মাংসের প্রকৃত পরানও তৈরি
করতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানীরা (ক্লোন পদ্ধতি)।
ক্রমবর্ধমান মানুষের খাবার জোগান দিচ্ছে
আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান- হাইব্রিড ফসল ফলিয়ে।
রোগ ব্যাধি অপুষ্টি থেকে রক্ষা করে
মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে-
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।
মৃত্যুহীন জীবনের সাধনা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।
৭
বিজ্ঞান মানুষকে এনে দিয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধি
গতর না খাটিয়েও পৃথিবীর মানুষদের
বাঁচিয়ে রাখতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান
ধনতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে ইহা হতে চায়না
শিল্পউন্নত বিশ্বের ধনীরাষ্ট্রগুলি।
বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন,
উনিশ শতকের সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস,

বিশ্ব বিবেক সোচ্ছার হলে
একুশ শতকেই সম্ভব হবে;
বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ কায়েম করা পৃথিবীর বুকে।
বিশ্বগ্রাম পৃথিবী তখন হয়ে উঠবে বিশ্ব পরিবার।
৮
প্রাণীর সেরাজীব মানবের জন্ম নিয়ে আমি ধন্য
ভালোবাসি, বুক ভরে যায়, যদি দেখি
দয়া মায়া, সেবা, যত্ন, শ্রদ্ধা, সম্মান,
মানুষের পর হিতৈষী কাজ।
ভাল লাগে না, মন কাঁদে
লোভ, হীন স্বার্থ, হিংসা পিষুণ হানাহানি মারামারি
মায়াহীন অমানুষের যত কারবার।
ভালোবাসি তবুও আমি মানব জাতিরে।
শুভ বুদ্ধি উদয় হবে এই আশায়
আমি বরাবর মানবের জয় গান গাই।
তারিখ : ১০-০৬-২০১৬খ্রি:

বিদ্র : দৃষ্টি ক্ষীণতা এবং হাত কাঁপানোর দরুন লেখক এখন নিজ হাতে লিখতে অক্ষম। তাঁর সৃষ্টি কর্ম এই কবিতাটিতে লেখকের জীবন দর্শনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

চাকমা ছড়া

শ্যামল তালুকদার

একজুর ছড়া

(এক)
আলসি বিলেই
এক্কো হ্লা আ এক্কো হ্লি
আমাত্তুন দিবে বিলেই,
বিলেউনে যিয়ত থান
আঘে ধানর লেই।
উন্দুরন্ননোর কজক কাজাক
বিলেউনে থান চুপ,
হ্লা বিলেইবো কালায় রাঙায়
হ্লিবো রঙান ধুব।
কাম ন'গরি রেদেদিনে
বানাহ্ ঘুমান যানা,
কাম থেইনেয়ো নেইদে পারা
অক্ত এলে খানা।
বিলেউনোসান আলসি দ' নয়
ইস্কুলত মুই যাং,
বেন্যাবেল্যা লেখা মাধাং
রেদোত মামাহ্ লগে থাং।।

(দুই)

বেল উধিল'
বেল উধিল' পহ্র ফুধিল'
এঝ' পড়াত বোই,
বই আন' আর খাতা আন'
আন' কলম হ্াদত লোই।
বাপ-মা কধা মান গরিবং
বই মাধাদে সুর ধরিবং
কন' কধা ন-কোই,
বরজন' কধাত কান পাদিলে
দেঘেয়্যা পধে পধ হ্াদিলে
পারিবং ডাঙর হ্োই।
এঝ' বেহ ঘে এক সমারে
এক্কান কধা কোই,
বেল উধিল' পহ্র ফুধিল'
এঝ' পড়াত বোই

.....

শ্যামল তালুকদার, বিশিষ্ট কবি, রাঙ্গামাটি ।

চাঙমা কবিতা

শিশির চাকমা

তিরোচ্চে স্ববনানি কানি যায়

তে বিশ্বযুদ্ধ চোঘে দেক্কে
দেচ ভাক অহ্দে দেক্কে,
কামিনী দেবান আ' স্নেহ কুমারর লেঙ মারামারি দেক্কে।
চাঙমা জমিদার উনর খেল দেক্কে
খুগি দহ্রে ঝারত ঝাক ঝাক মানুজরে পোলেই থাগদে দেক্কে।
সেক্কে কিয়ে পিঝেদি আহ্লেইয়্যা চেয়ারত বোই
চাঙলি দাবা তানি তানি য়েল ধুমোচাক
আগজ মিক্কে লুঙি মারদে দেক্কে।

তে কাপ্তেই গদার পৈদানে তম্বার বান দেক্কে
শত শত আদাম বুরিল রাজঘর বুরিল
রাজ মন্দিরর মঙ'র জুরেল

তে সত্তুরর যুদ্ধ দেগিল,
মোনমুরোত জিদেজিদি লড়ালড়ি মরামরি দেগিল
লো নাল ছড়াসান হ্াদি যাদে দেগিল।
যিয়ত পায় শবাসাল গোর তাঙোন কানির উড়নি দেগিল
খুলোচার আহ্র কহ্বার আরাচাগ দেগিল।

তে আঝায় বযত্তি মনেমনে স্বনর গিরিত্তি আহ্রেল
তে, তে কন্না, তে অহ্ল, তিগিনি বুচ্চে
লাড়েয়র লোরবো উনরে দেগিনে মনত সার বানিল
যেদক দিন সরানর জুরো আহ্বা চিদত্ ন' ফুদিবোগি
সেদক দিন মাধার তিগিনিত কিঝিক আর ন' বাঝায়।
তিগিনি বুচ্চের শবাসাল কানি যায়
পুরোন ন'অইয়্যা তিরোচ্চে স্বনানি কানি যায়।

.....

শিশির চাক্মা, কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, রাঙ্গামাটি ।

বীর চাকমা

জুঙোল তানানা

(মর পাগানা গাবুজ্যা নাদিন পুদিনুনো উদিজে)

চম্পক নগরত্তুন কালিন্দীপুর ঘাট পার ওহ্ই,
লাঙেল দিঘেলি আহ্দি যেই,

লুমিলুং ম জুম ভুইয়ো মোনঘরত।
তানঙর তানদে জুঙোলান তানঙর,
তানদে তানদে জিংকানীর বেল ডুবের,
ন' চুগোর ঘামানি এ দুক্ক্যে কবালত,
উদোনেই কমলে থুম অহ্ভ',
কমলে নুনজো ঘামানি চুঘেব?
কমলে থুম অহ্ভ' বেঙাপদত্ আহ্দান॥
ফাগুনোর পাদল বুইয়্যেরে,
কোগিলর মিধে গীদোসুরে,
কমলে অহ্ভ সুঘোর ঘুমযানা?

অক্ত থাগ'দে আহ্দ'
ঝুল থাগ'দে ঘাহ্দ'
দাগ' কধাত রোই যিয়্যে,
কালিক, মর বেসুনজুক মাধানে
অজাত্যে কালাকবাঝাগ'র পৈদেনে,
জিংকানীর পধত আহ্দা ওহ্য়ে।
সেনে মুই কঙর তোমারে উচ দোঙর
বেগ গাভুজ্যে নাদিন পুদিননোরে
অক্ত থাগ'দে আহ্দ'
ঝুল থাগ'দে ঘাহ্দ'
ন' অহ্লে পোতত্যেবা বেঅক্তত,
জিংকানীর গরানার পরে।

জুমত্তুন কামগরি এলুং ফেরত,
আহ্দি আহ্দি লুমিলুং ঘরত,
অম' কদ' উদিলো এগলেজা জ্বর,
রোজেয় দ্বিয়েন, কম্বল এক্কান,
তুও দ' ন' বঝের উমান
উধিল' দুগ জ্ব, সেনে বুরোকাল্যে
এজান বেনালর দুগ পাঙর

.....

বীর চাকমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও সুরকার, রাঙ্গামাটি ।

জগৎ জ্যোতি চাঙমা

বাচ্যে থানার অক্তগুন

মিঝে মর বাচ্যে থানা আওঝর বাচ্যে থানা
কন' এক্কান অচিন নক্ষত্রখুন তে লামি এব'
আঘাজর ধোক্যেন অঝার মনমঞ্জুকলোই এই পিথিমিত;
ঢাগা শঅরর রেদর ধোক্যেন এগমুধ দোর্যে গোজেব' তে ঘায ফিরিঙুনে।

জেবর ভিদিরে রাজরর ছেপবত্তালোই ঘাযফিরিঙুনে ফাওনর আভায় আভায়
বনরূবোর দপদাপধত থিয়েই সবনর অগচ খেবাক;
খালিক তে ন' এল'।

অক্তে অক্তে ঘুনুঘানা র' উধে তে এব'
সেক্কেনে ঘায ফিরিঙুনর আওঝর দুঅত কধক আঝা ফুরমারে
সেক্কেনে মনখলাত তরন্ননো কজমা ঘাচ্চানির আগায় আগায় হাপরর গাঙদামি
সেক্কেনে উত্তরর গাঙত থুবো অয় মন-পবনর গীদ
সেক্কেনে মুড়োয় মুড়োয় চানর পঅরর তিনাংফালাং;
খালিক তে ন' এল'।

.....

জগৎজ্যোতি চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙ্গামাটি ।

সুমীরণ চাঙমা

কাবাক ঝাবাক

চাঙমা কধানি যার লুগি
ষ্টাইল অহ্দে অহ্দে অহ্র ফাঘিবাজি।
চিলুমুনরে কধন শার্ট
কধগ গত্তাক আর' স্মার্ট।

পেন্দলং উনরে কধন প্যান্ট
চাঙমা কধানি কধে লাজান ছিগুন জেন্টেলম্যান।
খানানি যেইয়ে বোদোলি বদারে কধন ডিম
চাঙমা কধা নচিনোন কলে তজিম।
এহ্ রারে এহ্রা নকন কন মাংস
চাঙমা কধানি এড়্গান এড়্গান অহ্র ধ্বংস।
সবজি তরকারি কন লাদা পাদারে-
সুমি গুনরে কন সীম শসা কন ফলুনরে।
তেম্মাং চুলম্নুক নখোই কন পরামর্শ
চাঙমা কধানি চিপপুরের মহ্র অহ্র ধ্বংস।
ভাদ খেইয়োন আজু, পিজু দাঘি মেঝাঙত
ইড়্গো খা পরের টেবিল ডাইনিঙোত
পত্তানি পদ নখোই কন রাস্ত্মা
হলা ভাদ নখোই কন খেবং নাস্ত্মা।
আঘা ছালত নকোই কন ল্যত্তিনোত
চাঙমা কধা নকোই বাঙালা কধা ছপ্পানদ
পিধে নরে পিধে নকোই কন বিস্কুট
জম'দোস্ত্মিরে জম'দোস্ত্মি নকোই কন মজবুত।
ঘরানিরে ঘর নকোই কহ্ন বাসা
বাঙালা কধা নকোই কেইনে চাঙমা
বদা হলা নকোই কন ডিম মামলেএ্ছ
ভাদ জাম নকোই কন ভাদ পেস্নট।

লাম্বা চুলোনিরে কাবি গরন বাদিচুল
ছিগুনরে কঙে মুই ভদ্র ভূল।
ন'গানিরে ন' নকোই কন নৌকা
ভুলুনরে ভূল নকোই কন বোকা।
সমাস্যেরে সমাস্যে নকোই কন বন্ধু-বান্ধব
খাদ্যনিরে খাদ্য কন নকন খেবার-দেবার।
পিরেলেস্ন্যবরে পিরেলেস্ন্য নকোই কন রোগি
চাঙমা কধানি বাজেই রাগিনা ভেইলক কঙর ডাগিডাগি।
গরবা উনরে গরবা নকোই কন মেহমান
শিক্ষিত ওইনে কি? অভ' বুঝিনে? আমি কুবোন গমান ?
পর' কধালোই লুদুপুদু নিজো কধা নেই আমল
বারে ঝোকঝোড়্গ্যে ভিদিরে ব্যেঘ নগল
অপদরে পদ অগাদরে গাদ গোরি পারে মনে কলে
সুলম্নুগো নঅ পারেন্দি যায় সংমোদ থেলে।

.....

সমীরণ চাঙমা, বিশিষ্ট কবি, বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

তঞ্চঙ্গ্যা ইতি চাকমা

কগিলর র' শুনঙর

গাজো ঘুত্তেট বোয় আগং..
মুজুঙিন্দি লাম্বা বানিয়ে পানি পার,
আহ্ঝা লোই আহ্ঝি ঘুম যাদোন দি'বে সাজুরি বেরাদন।

উহুলেন্দি টাইলস ওর ফ্যাক্টরি
তারও পরে লাম্বা রেগাদি গারি এযের যার,
মানজর এ দম ফাদা হাম চলি এযের কধক কাল।
ওলোদ্যে ওলোদ্যে ফুল ফুত্তোন এইল এইল হের গোজেয়ি,
আরো ন'দিন পর ফ্রান্সত বসন্ত্ব এযের।
ফুলো কুরি ফুত্তোন..পাদা গোজার গাজে গাজে,
সোনা ধক্কেন রোদতান ফুত্তে জুরো আহ্‌ভা এযের।
স্কুলোত এ বজি আঘঙ দিবুজ্জে ছুটিয়ানদ,
পানিয়ানোর ঝিমিলানি আর এইল হেরানি দেগি
ম দেঝো কধা উধের মনদ।
ইক্ষিনে মনে অত্তে বজি আগঙ আমা ভুয়ো পারদ,
এইল এইল গুরি ধানানি ইজেরেন্দি মরে ডাগের কধক।
রিনিচেলে আগাচছান দেগে মুজুঙে পরি আগে,
ভাবি চেলে ভাবি ন পায় ম আদামান কুদু পরি আগে ?
এইল হেরানোদ তোগে পাঙর ম আদামো মাদিয়ান,
মিজে মিজে মনান বোঝে শান্তি্ব তোগাঙর।
বিঝু হুরে এলে কোগিলেস্না ডগরে,
ঠিক ইক্ষেও চিক চিক পেক্কুর গীত্তো কোগিলো ধক্কেন র' গরে।
কোগিলোর র শুনোঙর, এইল ধানানি দেগঙর,
বেন্যে পত্যে হুয়ো লগে ফুলো তুমবাজ পাঙর।
বিঝু এযের পারাপাং লগে নুও বঝরও,
বেন্যে পত্যে ফুল তুলিম ফুল বিঝুর দিনে,
ঘরে ঘরে বেরে খেম মুর বিঝুর দিনে,
বরা পিধে, সান্যে পিধে, বিনি পিধে আরও পাজন তোনও।
নুও বঝরত কিয়োঙত যেম বুদ্ধরে পুজো দিম,
সংসারত বেক্কুনে সুগে থেবালস্নায় মন ভরি বর মাগিম।

....

তঞ্চঁঙ্গ্যা ইতি চাকমা, Alfortville, paris

পহ্র চাঙমা

চিগুদ চাগাদ

পেট ভরিলেও
মন ন'ভরে,
তারে কয়দে আই
হলিদিনর নুনিয়ে হোচপানা।

হৃদয় চাকমা

কোচপেয়ে মনান

কোচপেয়ে মনান
বিধি যায় দিন, মাঝ বঝর
নুও ঘরানত নুও রঙ ধরে
কধক ফাগুনো আভা বিধি যার
কধক কোগিলো র বিধি যার
ওলোনশালান কালা খয় যায়

হায় থেলেও
বেজার বেজার ধঙ,
দূরদ গেলেও
তগে তগে আদামরা অন !
নুদি তিনতালাক্কে বিগিদি
চিগুদ-চাগাদ গরে,
দেগাদেগি অলে বজান
মনান হোচপানা পিজের গরে !
ইক্কা অলে পুজুদ
হোচপাঙ চিজিবো তোরে,
মজুং দেদে ন'দেদে
ওই, আ ইয়েন হি গরে !
ধরাধজ্জেত্তুন আহ্‌দ ইরি গেলে
আঙ্গুলো মাধায় মাধায়,
তগাতগি গরেদে গরে
হুধু লুগি যায় পিজেরে লোরে !

হোচপানান তিবরন্নগ তাবরন্নগ
জুদে চান্ধালে তে ন'জানে,
গম লাগিলে আমিজে হধা হো
খাদি পেজদ তেবাত্তে মোরে !
সিক্কে হোচপানা মিদে গরি
জোগরা অয় জমি তে'বে,
গিলিলে সুওদ লাগিবো
যোক্কে লারে গরি মু' দিলে।

....

পহ্র চাঙমা, উদীয়মান কবি, রাঙ্গামাটি ।

জেভিয়াস চাকমা

লারেই

কেল্যে রেদোত পোত্যা স্ববনত
পোতপোত্যা গোরি ভাঝি উধি মা কত্যে-
ও পুত্ অমকদ' দুঘত আঘং
কন'জনে লাদি মারি দিদোন লো ঝোরেই

কয়েক জনে দিদন তদা চিবি
সেনে ন'পারং ভাচ্ নিঘিলেই।

আ- কয়েক জনে নিদোন কারি ত' জাগান
চিদে গরঙর পুত
কেনে বাজেবে ত' নিজো পরান।
মুই অহ্লুঙ্গে - অহ্মা লারেই গোরি কানং মুই
এক্কাও ন' দোরেচ তুই।
কেনে মুজুঙ্গে উজেয় যেম
বানাহ্ তুই চেইয় থেচ্।

লাজারি কাদা শন' কাদা থেলেও
লাধি মুগোর গুলি খেলেও- এভা ন' দিম ম' আধানা
ওহ্ হিল চাদিগাং নাঙে মা
ভঝ পারেই দি- ন' পারিবেক
আমা বেগর মাদানা।

তরে মা, বাজেবার যেইনে
যে জুম্ম ভেই-বোনুন আহ্ঝি আহ্ঝি
দিদোন নিজোর পরান।
দিদোন নিজোর রাঙাবুগর লো
তু নং দিদোন ঝোরেই।

.....

জেভিয়াস চাকমা, উদীয়মান কবি, শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি ।

ভদ্র সেন চাকমা

দশ'ই নভেম্বর'

দশ'ই নভেম্বর'
সিরিত্তি কধা এযের এযের ভেই-বোন লগ,
এযের- মাধা নিগুরি, সাত গাঙ সাজুরি, দিন্নো এযের আ-গোরি।
মোন-মুরত, ছরা থুমত,
শহর-বন্দর, ধুধুগ'ত, ধুলুক বাজেয়- গিদে-রেঙে দজ্জ্যাকুল সাজুরি ।

কন্না এযের ? কুত্তুন এযের ?
মনত্ তুল' আমল দি।
কঙ'র সালে কিঙিরি অল' দশই নভেম্বর সিরিত্তি ।

১৯৮৩ - সাল'র নভেম্বর' দশ পুরত
দাঙ'র এক্কান ভুজোল বেইয়ে - হিল চাদিগাঙ' ত ।
গোদা পিত্তিমি লরি উত্তে, আঙোচ্চে রেদোর আন্দার'ত ।
আন্দার রেত্তো গোঙি গেল'
পোত্তে বেলান উধো ধলস্ন', খব'র এক্কান ভঙি এল' দেবা কালায় ঝিমিলেল'।
"গণলাইন" ভরি গেল' মানেয় ভরণ উধোন অল' "ডাক্কো পেদা" কোই গেল
গেলেস্ন রেদোত "বাগমারা" তারম্নম'ত- গিরি, প্রকাশ,
দেবেন' আহ্ধত জুম্ম জাদর সোনাত্তুক্কো - এম এন লারমা খুন অল ।"
আঘাঝ্ ভাঙি মাধাত্ পল' থুত্তে বোয়ের বেই গেল'
দেবা কালার ঝিমিলেনিত - আঘাঝ'বাস পরি গেল' ।
আহ্ধ' তাগল ঝরি পল' পেদ' ভুক মরি গেল'।
চোগোত পানি, কবালত আহ্ধ, ধুন্দুক খেই খেই কানা ধলস্নাক ।
বুর-বুরিয়ে উচ দিলাক, জধা অভার উঘুম দিলাক ।
চোগ পুঝি, কমর হিঝি - লারেই ফাং গলস্নাক ।
আবদ-বিবদ গোঙি গেল'
বিজগ' পাদা ভরি গেল'
উদেত্তে বেলান মেঘে ধলস্ন'
দুগ'র বিজগ ফগদাং অল'
সিত্তুন ধরি - নভেম্বর' দজ পুর-
এম এন লারমারে সুরন গরন গোদা পিত্তিমিত ।

.....

ভদ্রসেন চাকমা, প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

কে ভি দেবাশীষ চাকমা

মেঘ

ও ধুব মেক্কানি, তমার কদ' মনত সুঘ
আগাজদ উরি উরি থেই পার।
চাক চাক ওই ভঙি পার
এক চাক ওই থেই পার
তমা সান্যে মত্তুনও মনে কর

উরি উরি বেরেবার, ভঙি ভঙি থেবার
পিথিমিত বুগোদ ছাবা দিবের।
ও আগাজ' মেক্কানি, তুমি কদক দোল
বর মোনোত উধি রিনি চেলে
কি দোল লাগে তমারে দেলে।
চাক চাক, কাব কাব, অজল-নিজো
ধুব, কালা, রাঙা, কত্তা কত্তা
যেই উজো থাগ' সেই উজো ছাবা পরে
কাম্য মান্য উজো থেলে, কাম্য মান্যে
কাম গত্তে সুনযুগ পান, তমা ছাবা পেলে।
ও উরি উরি, ভঙি ভঙি থেইয়ে মেক্কানি
তমারে পেলে একজনর মনত দুঘ বাদে
বেগর অয় মনত সুঘ
কার মনত দুঘ অয়, কোই দোঙর মুই।
টুকোত টুকোত রিনি চার, বেলান কদ্দুর যেইয়ে
কদ্দুর গেল, মেঘ ছাবাবো কিত্যে এল'
ধানুন এচ্যে ন'শুঘেবাক,
কঅর, ধান রোদোত দিএ্যা মানুচ্চ
ধান ন' শুঘেলে, বারা বানি ন' পেব
ইয়েন তার মনত দুঘ।
তে্হ বাদে কারোর মনত নেই দুঘ,
বেগর অয় মনত সুঘ
ও মেক্কানি, তমারে দেঘি মুই খুঝি
ইয়েনও মর মনত সুঘ।

.....

কে ভি দেবাশীষ চাকমা, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।

সুনাম দেওয়ান

বিঝু

কেল্যে অভ' ফুল বিঝু
মনান গরের ভিরম্নং ভিরম্নং
ভাবঙর মামা কক্কে পহর অভ'
বেন্যে পোত্যে ফুল তুমি আনিনে

বিঝু ফুলস্নই সাঝিদং।

ফুলস্নই সাঝে দিম ঘরান দ' অল'
লাগিব দেক্কে
মনান লাগিব' হুঝি হুঝি
ভাবঙর মামা হক্কে পহর অভ
নানুরে গাদেস্মই কক্কে।

বেন্যে পোত্যে পহর অল
ফুল তুলিবং, আজু নানুরে গাধেই দিলং
বর জনরে আহধ জুর গোরি ঝু-ঝু জানেলং।

তার কেল্যে মূল বিঝু
মনান ন' চায় আর থেবার ঘরত
গুরো বুরো বেক্কুন যেবাক এ ঘরত্তুন উঘরত
বেল্যে মাধান সাঝন্যে অক্তত যেবং বেগে মিলি
গাবুজ্যে গাবুরি সমাজ্যে সমারি
অভং বিঝুত খেলিস্ন।

.....

সুনাম দেওয়ান, উদীয়মান কবি, রাঙ্গামাটি ।

কিকো দেওয়ান

বিঝু তুই এলে

ফাগুন আভা লোই এযে বিঝু দিন
বঝর যুমত উক্ক বিঝু দিন ও বিঝু দিন।
ফাগুন রঙে রাঙেই দিন।
ও কোচপানার বিঝু দিন ॥
পিনিন খাদি পিনি বুগত

তেঙোকরাদি মনর খুবি
বিঝু এলে
ধুধুক শিঙে বাঝি বেই্ গিদে রেঙে পারায়
---- বিঝু দিন মাদানত।
জুন পহর ফুদিলে ঘিলে নাধেং খারা খেলেই।
মনর খুঝিয়ে পালেই বিঝু দিন॥
নুও বঝরত নুও দিনত কিঙত যেই।
বুদ্ধ ইধু বর মাঘিয় সুখে থেবার জনমান।
কোচপানাই ভরি উধে পিত্তিমি আন॥

.....

কিকো দেওয়ান, শিক্ষার্থী, লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রাঙ্গামাটি ।

চুংকু চাকমা

চিজি

চিজি তরে মুই কোচপাং
এপিত্তিমিত দোল তুই
ইয়েন আগাঝর পূর্ণিমা চানান।
তর নিজেনী
গোন্দা রেদ ভাবী চাং
ন'দ' বুঝস তুই
ন'দ' পেলুং মুই্
জিয়েন মুই তত্তুন চাং।
সেক্কেত্তুন ধরি
গোদা জীংকানিয়েন
থেলুং মনত গোরি
তরে তোগাদে
সাত দোয্যা গেলুং সাঝুরি।
স্ববন মরে দেগেলে
দ্বিবে চোখ ফুদিনে
পিত্তিমিয়েন দেগেলে।

.....

চুংকু চাকমা, শিক্ষার্থী, রাঙামাটি পাবলিক কলেজ।

ইন্দ্রদত্ত তালুদার
ও বিঝু

ও বিঝু তরে বাজানা কিঙরী
বিঝু তুই পত্তি বজর এজজ যাজ
ফুল বিঝু, মুর বিঝু, গজ্জে পজ্জে তিন দিন
আমার জুম্ম জাদর ঘরে ঘরে থাজ।
তিন্ন দিন ফুরেলে আমা বেগরে ফেলেই যাজ
গদা বজরবুআ কুদু কিঙরী কাদাজ।
তুই এলে, আজি মাজি উরম্নত্তুল পরিযায়,
বেগর চিদে পরিথায়,
বিঝু তরে কিঙরী দোলে দালে পালাযায়।
ঘড়ে ঘড়ে পাজন থোন, বরা, চান্যা বিনিপিদা,
বেরেই, বেরেই আজিখুজিয়ে পাচন পিদা খানা,
মনানী বেগর অয় দোল
দেঘা-ন-যায় হিংসা পিজুম হোল।
এই তিন্ন দিন বানা খাবানা দাবানা
হোল কুয্যা প্রাণীহত্যা প্রাণীবধ
বেয়্যাগ পাপ কাম বাদ
এইল পাদায়্যে ন চিনানা।
বিঝু তুই এ্যাদোত তুলি দুয়াচ্ছি রিতী সুধাম
বাজানার বাজী থেবার কদানী
সুদিনর সুমাদন, গীত, রেং কারানী,
এ্যাদোত তুলি দিয়োজ পোষাক আষাক
কৃষ্টি, সংস্কৃতি বাদ্য যন্ত্র বৈদালি মন্ত্র-তন্ত্র
এক্কে আজিজা দুয্যে নিয়ম কানুন
দয়া-মায়া লোবিয়ত চিত পুরানী।
ব্যায়াগ শিঘাচ্ছি পড়াচ্ছি এ্যাদোত তুলি দুয়াচ্ছি
কিঙরী বাজীবং বাজীথেবং বিঝু কই থানা
কিঙরী দেজ জাদরে বাজানা।
বালক বজর অল তরে মানজ্যরে চিনিবাত্যায়
পত্তি বজর দোলে দালে গরা অয় রিলি।
হিংসা পিজুম নেইয়া গরি মিলি ঝুলি

ইক্কে চিদা চুম্মে তুইঅ আজি যাজ বিলি।
বিজুর কিজু সুধাম আজি যার
আগদিনত গাবুজ্যা গাবুরী কারকুজ্যা গুরা
কমরদ কুরম্নম বানী
আদ্দাম্ আদ্দামে [illegible] ঘড়ে
ইন্দ্রদত্ত তালুকদার
অয় অয় গরী কুরারে দিদাগ আদার।
গাবুর মিলা, আধাগাবুজ্যা ঝাগে ঝাগে মিলি
ঘরে ঘরে যেই বুরাবুরি গাদেদাগ
বুড়ারে আদুপারি টেঙত জু-দিদাগ বর মাগিদাগ
বর পেদাগ বেক্ষুণে খুজি অদাগ।
আজি জিয়ে গাবুজ্যা গাবুরি রান্যাত তৈন তগাযানা
এক্কে বিঝুত কিজু কিজু ঘরত দেগাযায় গুরম্ন এ্যারা খাবানা
দেগা নজার নুয়া বজরত মালিক্যামারে ভাত দেনা
বুড় বুড়ি ভাত খাবানা।
আজিজার মান্য-গন্যরে ঝু দেনা
আজি যার রেতটিয়া গেংখুলী গীত শুনানা
আজিজার শিঙা, ডুডুক তাগ, হেংগরং খারা
নাচ-গীত, রং-ধং, পোশাক, ভাষা
ইক্কে তর আজল নাঙ আজিযার থৈ দিয়োন বৈশাবী ।
বিঝু তুই এলে তে, দেবায় জিমিলেত্তে দুক্যা দেগানা
ও বিঝু তরে বাজানা কিঙরী ।

....

ইন্দ্রদত্ত তালুকদার,বিশিষ্ট কবি ও নট্যিকার এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক, রাঙ্গামাটি ।

নির্মল কান্তি চাক্‌মা

ধুলি

সি কুজ কুজ সি কুজ কুজ
লুঙি মারে ছায়া
মা বাবত্তুন চুর গুরি
ধুলি খেলেগি হারা।
মা- বাপ জুমত গেলে
চিজিরে রাগে পায়
এক্কা গুরি সরান পেলে
খারা খেলা যায় ।
ধুলি,ধুলি ও ধুলি
তাম্বা তারে ডাকে
তাম্বা ইন্দি উদের বজের
চোগে ন দেগের রাগে।
হারা মাত্তলে পুরি ফেলেম্নগোই
মগাউন মাজি তোবার
তাম্বা যেত্তেই জমিত্তুই ফিরিনেই
ধুলিরে সিদি থোগার ।
এত্তে ন এত্তে দুমুক দুমুক
ধুলি খেল মের
ধুলি গেল কানি কানি
বেলান সেক্কেড়ুবের ।
চিজি কানের চেরাং চেরাং
দুধ খেধ চায়
তাম্বা ইন্দি কামে ন তাউহরে
রাগে গির গিরায়,
হেজেক হেজেক মগা মাজে
উন্দি বেনবেনায়
কেলেম্নত্তুন ধুরি হারাত গেলে
ভাত নদিম ,তরে গায়।

.....

নির্মল কান্তি চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও সংগঠক বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

উদয় শংকর চাঙমা

ম' মনান গম নেই

এচ্ছে ম মনান গম নেই
সন্ধ্যা মালতি, গোঁয়ে ফুল উদোনর এক কুনত
ফুদি চেরোপালা তুমবাজ ছিদি পরে
ভঙরা মনত রঙ ধরে
মুও পুক্কুনর পেঠ পুরে!
গুদির ফুগুদি কানা আভাক ভাক
মুই চেই আগং এক রেনি
এচ্ছে ম মনান গম নেই কিনত্তেই।
কেনেই বা গম থেভ-
এ মাদির সাগিম রাগে দি আহ্‌ধ দি কঙর
মুই কেনে গম থেম।
বুগর আহ্‌র ভাঙি ইত্তুক ম পরান ঘর
এ্যরা প্রেত্য ঘভা বানে দের,
কৃষ্ণচূরার রাঙা চিজিক্য সান লো অনজুর থেবায়।
কয়েক বজর আগে, মুরল্যে চাগালা
চেঙে মেয়োনি কাজলং শঙ্খ বরগাঙ পারে পারে
এ মোন উহ্‌ মোন ফুর মারি তুমি আমি
মিলিনেই ঝাগে ঝাগ কদ জুম ঘরত
বেরেয়েই, ঘিলে খারা, নাদেং খারা, বুলি খারা
শিবচরণর গোজেন লামা, রাধামন ধনপুদির
পালা গীদ, গেঙখুল্য নানুর উভোল ফাল পালা গীদে
আদাম উম ওই উধিদ!
গাবুজ্যে-গাবুরীর উভো গীদর রেঙো চাক পরিদ!
এচ্ছে ম মনান গম নেই!
অদিন্য বারিজের কালা মেঘে ঢাগি আঘে
মর এই বিঝুত বেরেয়্যে জাগানি।
কালা কবায় ঝাগে ঝাগ ঘুরদন
যে্যে জাগাত তর মর থেঙ হুজ পরি রোয়োন।
সেনে দ, এচ্ছে ম মনান গম নেই।

.....

উদয়শংকর চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙ্গামাটি ।

শিখা চাঙমা

থরে থরে

কন' এক দিন্যে থরে থরে
যিয়ং গাই বাজত বই
আগে থাক্কে সমার জুধেই ন' পারিনেই
যেয়ং মুই গাই দোরেনে
যেয়ং মুই গাই দোরেনেই।
যাদে যাদে ভাবনাত এযে
এই যেন ন' পারিলুঙ যেই-
কন' কেত্যে কনদিন ন' যাঙ্গে গাই
চিগোনত্তুন ধরি সমার পেয়ং
সমাজ্যেউনর চেষ্টায়।
পরান সৎপত্যে থেং থর থরে
দোরেই লুঙিলুগই কেজান ওই।
তেঙা দিনে গাড়িত্তুন লামি
চোখ রাঙেনে দেখ্যেং
কয়েক্কান গাড়ি এক সমারে থিয়েই আঘে।
ও হদা, মর দর যে আর নেই
কেনে আনিস্মই ভগবান ঘরত যেবার টিকেত্তান

দোরেই দোরেই উযেই যাঙর
আ বার বার ভাবঙর-
ফিরি যেই পারিম কি কনদিন?

.....

শিখা চাঙমা, উদীয়মান কবি, রাঙ্গামাটি ।

মৃত্তিকা চাঙমা

মুঘোছুরি আদামান

ইহ্ধত উধে আহ্মত্তলে পানিয়েন
কি অল' আদেক্ক্যা গোরি এ্যাল ভাঙা তেরাগুন
প-প ভাঝদন গাচ্ছুন, গরা আবারেই
ব্যেগ কাবদন আম জাম কাত্তোল করঙা লিচু
চোন্দুল চোন্দল ওই আঘন মুঘোছুরি গাচ্ছুন।

ডুবুলো খের কেচ্ছ্যা বন মুঘোছুরির পারর শিলোপুও
ঘুমত্তুন উধিম, সমারে খারা খং-
চক খারা পেখখারা সমাজ্যা সাধনমুণি ভুলস্ন এ্যাই
ব্যেগ ডুবি গেল পানিয়েন ধেলগায় মুরবত-
গলি যার খয় যায় ইহ্ধত্তুন ব্যেগ উধি যেই
তিন বংশ তিন পুরস্নষ কনে কুধু মুনিপুরি নেই।

আহ্ঝি যেইয়্যে চিন পয্য মনর রিবেং
ইত্থেন চুগুনো কাণাহ্ মাল্যে পিরে নেই
ভোদেলে উহ্ঝ নেই, কনে কুধু সেত্তেরা ওই-

ন' চিন্যেরে চিনঙর
ন' মাদেয়্যেরে মাদাঙর
ন' ডাগিয়্যেরে ডাগঙর
নয় ইত্তোরে ইত্তো বানাঙর
ম' পেজেলামে পেজাল গরঙর
কুরো কাপ্পে কাপ্পে বন্দা কাবঙর
ইত্থেন চুগুনো ওই আঘে জানে কাচকাবাচ্যো

লেফ দিএ্যা ওই আঘে রঙচঙান
গাপ্পান উধি গেলে মনর ঘুফ ভারি যায়।
আহ্মত্তলে পানিয়েন ধেলগার
পঝা বিরে তুলো- ওই এহ্ধে বোয়ের আগারে তানি যার
দার তানের চনাবা হুল' লেই পেদা
ঘ্যেঁহ্ত ঘ্যেঁহ্ত ঘ্যেঁহ্ত গোরি' মুঘোছুরি আদামান পিঝে থার।

.....

মৃত্তিকা চাঙমা, শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি ।

তঞ্চঁঙ্গ্যা কবিতা

কে. শুদ্ধধন তঞ্চঙ্গ্যা

নেতা

নেতা তুই কুরন্ন, কমলে আবে?
নেতা তুই পি-আয় আমা বুগ বিরে
তো-এ কসালি গং আজা আজা বুগ বিরে।
তুই নাই পাগি আচ্ছ্যা আমি করক
দুগ পা-পি মুগা-মুগি গোই বাচি আগি।
নেতা-তো-এ আমি বুত গমপাই।
যে মুগা-মুগতি লাগেত ত-ডুক্ক্যা
এককোয় সেদাম আগে নেতা
নেতা তুই কুরন্ন, কমলে আবে?
কমলে আমি সি-দুগ লাগানে
মানোইতসুনে চিকগোইবং
কমলে পাবং আমি আমা স্বাধীনতা?
 নেতা তুই বেয়াক হান বুসইত
নেতা তুই বেয়াক হান পাইত
তো-কেনে তুই অলক গোই তাইত
ত্বুই কোই-সা কমলে পাবং আমা স্বাধীনতা

.....

কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঁঙ্গ্যা, তঞ্চঁঙ্গ্যা সংবাদ অনুবাদক ও পাঠক, বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি ।

বাংলা অনুবাদ

কে. শুদ্ধোধন তঞ্চঙ্গ্যা

নেতা

নেতা তুমি কোথায়, কখন আসবে?
নেতা ফিরে এসো তুমি আমাদের হৃদয়ের মাঝে
তোমাকে আহ্বান করি হাজারো কষ্টের মাঝে,
তুমি নেই বলে আজ আমরা
বেঁচে আছি কত কষ্টের সংগ্রামে?
নেতা তোমাকে আমরা অনেক ভালোবাসি।
যে সংগ্রামে দরকার তোমার হাত
একজন সাহসী নেতা
নেতা তুমি কোথায়, কখন আসবে ফিরে?
কখন আমরা অন্যায় অত্যাচারির
বিরন্নদ্ধে দাড়াবো রন্নখে।
কখন পাব আমরা আমাদের স্বাধীনতা?
নেতা তুমি সব কিছু বুঝ
নেতা তুমি সব কিছু জান
তার পরও কেন চুপ করে থাক।
মুখ খুলে বল কখন পাব আমাদের স্বাধীনতা

ত্রিপুরা কবিতা

Mukul Kanti Tripura

Talpilani Horo

Beteng kuchung tunui talni munuima,
naithok, pohorjak akhaibo kachang.
Purnimadwi sia sungni nangya kobor bakha
rutukgwi naia, sia boroni achaikha.

Achokkha chakerengni pandarago,
yago lakha kacham chaktorotoro sumur,
subwi tisakha haparni khhorang sakni bakhabai,
kachang khorang buljagwi thangka terangtwikalaio.

Pohor-andarni hapong batangni mangpili
tunui pohor, naikhai salkajaktwi.
Bosontoni toksa kungkila pungdong tabokboo
mungsasuk manyani bakha hamyagwi
akata nini mango mokol kalawi
sondorjia matortani faika nung
tani katal khawi khachuno khalang?
Sajailang naithok khawi
nainani jar naithok hani porino kosol rajani bahajok.

Nung faika sio,
mator thujak tokraja, birjak chumuirok
wa bulungni yongsa pungnai khorang
siaro ni thuichor tuichor pohorni thungnai
tani esuk korekara, kabang koreo tunui?

.....
.....

মুকুল কান্তি ত্রিপুরা , প্রভাষক রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ ও সম্পাদক গিরিপ্রভা , রাঙ্গামাটি ।

বাংলা অনুবাদ

জ্যোছনা রাতে

বড়ই উজ্জল আজ চন্দ্রের হাসি,
সুশোভিত, আলোকিত এবং মিষ্টি।
পূর্ণিমা কিনা প্রশ্নাতীত ব্যাকুল হৃদয়
খোঁজ করেনা, জানে না কোথায় সৃষ্টি॥

বসেছি মাচাংঘরের এক কোণায়,
হাতে নিয়েছি পুরানো খয়েরী রঙের বাঁশি,
পাহাড়ী সুর তুলেছি আপন মনে,
সুমধুর প্রতিধ্বণি ধ্বণিত হয়ে মিশেছে ঝর্ণাধারায় ।

আলো-আঁধারী সারি সারি পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি
আজ আলোকিত, পরিস্কার যেন দিবালোক।
বসন্তের কোকিল জেগে জেগে ডাকছে এখনো
হয়তোবা কোন এক অতৃপ্ত বাসনার তাড়নায়
হঠাৎ তোমার অবয়বে দৃষ্টিগোচর দুনয়ন
অবাক হয়নি বটে, তবে কেন এলে?
কেন নতুন করে বাঁধলে খোপায় বাঁধন?
সাঁজলে অপরূপ রঙিন সাজে
যেন রূপনগরীর পরীরূপী রাজকন্যা ॥

তুমি এসেছো জানি ,
কিন্তু ঘুমন্ত্ম পক্ষীরাজ, উড়ন্ত্ম মেঘেদের দল,
বাঁশবনের জিজি পোকার ডাক
আর জোনাকির নিবু নিবু আলোর খেলা
কেন খুব কাছাকাছি, বেশি আপন আজ ?

বাংলা কবিতা

জড়িতা চাকমা

আজি এ বসন্তে

পহেলা ফাগুনে আজি, রঙিন-সাজে এসেছে বসন্ত্ম,
সাথে দখিনা হাওয়া, বিঝু পাখী রব, কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ।
ফাগুন এসেছে বনে বনে, নব পলস্নবিত বৃক্ষারাজি দুলিছে হাওয়ায়
ধন্য হোক সবার জীবন, বাসন্ত্মি ফূলেল শুভেচ্ছায়।

ধুয়ে যাক, মুছে যাক, দূর হোক জীর্ণতা, হীনতার-মন্ত্র,
জেগে উঠুক মানবতা, জাগরিত হোক অহিংসার মূলমন্ত্র।
জুম্ম-পাহাড়ে, এলো বসন্ত্ম, নিয়ে এলো বিঝুর শুভ লগন,
যত দুঃখ-যাতনা ভুলে, বিঝুকে মোরা করবো বরণ ।

পথে-প্রান্ত্মরে ফুটেছে ফুল, হেলিয়ে দুলিয়ে সৌরভ ছড়িয়ে,
দশ-ভাষী, চৌদ্দ জাতি রয়েছে যেথায়, সব বাঁধা পেড়িয়ে।
বিঝু- তুমি আনন্দের, তুমি সবুজের, তুমি আশার, তুমি তারন্নন্যের,
তুমি-এ দেশের মাটি, এদেশের বায়ু, আদিবাসী জুম্মদের।

বসন্ত্মের বিদায় ড়াণে, ঐতিহ্যবাহী বিঝু আসিবে যুগে যুগে,
সু-স্বাগতম বিঝু তোমায়, আদিবাসী জুম্মদের ঘরে ঘরে।
তুমি শুধু জুম্ম পোষাক, জুম্ম কথা, জুম্ম খানা, জুম্মগান নয়,
বিঝু মানে জুম্ম জীবন, নির্ভয়ে দুর্জনেরে করো পরাজয়।

বিঝু- তুমি অতীত, বর্তমান আর অনাগতের দিশারী,
এই জুমের, আলো-বাতাস, সবইতো ছিল মোদেরী।
জুম পাহাড় ভাল ছিল, জুমের কেউ তাড়ায়নি জুম্মদের,
দূরাগতরা কেড়েছে শান্ত্মি, সর্বনাশ করেছে তাদের।

কালো মেঘে ঢেকেছে পাহাড়, করেছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী,
সমতলে-পাহাড়ে আজি, পড়েছে শকুনির শ্যেনদৃষ্টি।
আসিবে আবার পুরোনো বিঝু, ছড়াবে খুশী আদিবাসী জীবনে,
ধ্বংস নয়, সৃষ্টি চাই, হোক জয় মানবতার, বসন্ত্মের এ লগনে।

.....

জড়িতা চাকমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি।

নিও হ্যাপী চাকমা

আমি নারীবাদী নই অধিকারবাদী

আমি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ
পাহাড় সমতলের নিষ্পেষিত নারী
যখন দু'মুঠো ভাতের জন্য
দু' হাতে কাস্তে, মাস্তুল, দা, কোদাল
মাথায় তুলে নিই কঙ্করের টুকরি
সবজির ডেরা, গার্মেন্টসের উচ্ছিষ্ট কাপড়
তখন লোলুপ কুকুরেরা জিহ্বায় লালা ঝরিয়ে
দু'চোখে গিলে নেয় রক্ত মাংসের ভবনটাকে!
আমি আমার নিরাপত্তার অধিকার চাই।
জামদানি, কাতান, দামি সব্রান্ড নয়----
লজ্জা ঢাকার এক টুকরো কাপড় চাই;
আলিশান ভবন, সুরম্য প্রাসাদও নয়----
শুধু মাথা গোঁজবার একটি আবাস চাই;
অভাব আর দুপেয়ে হায়নার বীর্যের ভয়ে
বিয়ের পিঁড়িতে না বসে দেবী স্বরস্বতীর
পুজো, আরাধনায় আলোকিত হতে চাই;
পীড়ার জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরার আগে
একটু ওর‌্যাল স্যালাইনের জল আর ট্যাবলেট চাই।
আমি নারী পুরন্নষের সমঅধিকার চিনি না
যৌনাঙ্গের স্বাধীনতা চিনি না,
কী কাপড় পরবো, না পরবো
বাসে সিট পেলাম কি পেলাম না
তাতে কিছু যায় আসে না।
আমি তনু, সুজাতা, আফসানা, কল্পনা
এ সমাজের ঘৃণ্য পশুদের হাতে
ছিঁড়েখুঁড়ে মরবার আগে শুধু, শুধু
নিঃশ্বাসের নিরাপত্তার অধিকার চাই।
আমি নারীবাদী নই অধিকারবাদী।

.....

নিও হ্যাপী চাকমা, বিশিষ্ট কবি, ঢাকা।

উ উইন মং জলি

অনন্ত যাত্রা

গহীন অরণ্যে যে ফুল ফোটে অনাদরে
তারই জীবনী লিখে চলি হৃদয়ের ফলায়
স্বকীয় ঐতিহ্যে ভরে তোলে হরিৎ আভায়
সুবাস ছড়ায় দিগন্ত্ম ছাড়িয়ে দূর নীলিমায়।
তার এই সমুজ্জ্বল সুবাতাসে এক অশরীরি
মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করে সেজে সন্ন্যাসী
নিভৃতে কেঁদে বলে,"কুমারী হলো কলঙ্কিনী"!
বেরসিক এক পরিব্রাজক দেখে ফেলে আকস্মাৎ
তার ঐশ্বর্যে মোহিত হয়ে পাতে মরণ ফাঁদ
ঐ ফাঁদে পা ফেলে সহজ-সরল বনমালি
সেই থেকে লুপ্ত চির-হরিৎ লাবণ্য রশ্মি।
কৃষ্ণ-লীলায় রাধীকা যেমনি হয় ক্লান্ত্ম
ভিন কাননের শোভায় তেমনি সর্বশান্ত্ম
নিজেকে মানাতে ধূসর হৃদয়ে নিরন্ত্মর লড়ে
ঝড়ের বাতাস এসে তবু কলঙ্কের আচর কাটে।
অতীতের সৌন্দর্য-খচিত-ক্ষণ আজ পরাহত
মহাকালের আবর্তে জাগে আবার কাঙ্খিত দ্রোহ
অসারতাকে দলে দিয়ে খেলে রক্তের হোলি খেলা
স্বল্প আলোয় আঁকে অনন্ত্ম কালের সূর্য-রেখা।
শকুনেরা যতই ঠোকর মারে আর করে পরিহাস
জাতিস্বরের জন্যে ততই লেখে নতুন ইতিহাস
কলঙ্ক ঘোচাতে তার এই অন্ত্মহীন পথ চলা
এ যেন আকালের এই কালে ভিন্ন ফসল ফলা।
জুমে-জুমে সুশোভিত পুষ্পের নন্দন কানন
ভরে ওঠে নব প্রজন্মে চির অনন্ত্ম যৌবন
নব বর্ষে মানবতার গান গেয়ে এগিয়ে যায়
ইতিহাসের বন্ধুর পথ পেরিয়ে অনন্ত্ম যাত্রায়।

.....

উ উইন মং জলি, বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার বান্দরবান।

মানসুর মুজাম্মিল

আজ নতুনের ডাক

আজ নতুনের ডাক
নতুন দিনের স্বপ্নে সবাই
দুঃখ ভূলে থাক...

আজ নতুনের ডাক
রাগ গোস্বা হিংসাটারে
জুতার তলায় রাখ...

আজ নতুনের ডাক
গলা ছেড়ে পাখিগুলো
জীবনের গান গাক...

আজ নতুনের ডাক
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যাবার
সবাই শক্তি পাক।

মানসুর মজাম্মিল

লড়্যা লোক

লড়্যা লোকের ভাত জোটেনা ভাত
কষ্টে তারা কাটায় দিন ও রাত।

চিরকালই তাদের কপাল ফাটা
চোখের ওপর ঘোরে লাঠি-ঝাটা।

তাদের ভোটে মেলে কারো চেয়ার
পায়না তারা একটু ভালো পেয়ার।
হায় কী তারা চিরকালেরবোকা !
জনমভরা খেয়ে যাবে ধোকা।

.....

মানসুর মুজাম্মিল বিশিষ্ট কবি সংগঠক ও প্রকাশক বাংলাদেশ ঢাকা।

সুপ্রকাশ চাকমা

ভাললাগা বিঝু

তোমাকে ভালোবাসি
কারণ, তুমি আসলে আসে ফাগুনের হাওয়া
উত্তরা-দক্ষিণা, পূবালী-পশ্চিমার মাতাল বাতাসে
ভেসে আসা কোকিলের গান
আমার বড়ই ভালোলাগে।

মনের মাধুরীতে উড়ো উড়ো ভাব
পাহাড়ে গাছ-গাছালি সুবর্ণতা ফিরে পাই
আকাশে মেঘের আড়াআড়ি খেলাতে
হঠাৎ বৃষ্টি নামে
তুমি যখন আসতে থাকো আমাদের মাঝে।

ছেলে-মেয়েরা আনন্দে ভাসে
যুবক-যুবতীদের যৌবনতা বাড়ে খুশির মেলাতে
বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পুরানো দিনের স্মৃতি জাগে
এক কথায় বুঝা যায়
তুমি আসলে সবারীর মনে খুব ভাললাগে।

সুপ্রকাশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও সরকারী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি ।

লালন কান্তি চাকমা

স্মৃতিতে বান্দরবান

কোথায় বানর, কোথায় বন
দেখতে এলাম বান্দরবান।
কথায় কাজে মিল পেলাম না
নাম ধারনে নেই যে মানা ;
বৈচিত্র্যে ভরা জন-জাতির ঠিকানা।

স্বর্ণ মন্দিরে সোনা নেই
পাশে দেবতার পুকুর
দেবতার নেই কোন উপদ্রব
পুষ্করিনী স্বচ্চ জলে টইটুম্বুর।

দর্শনীয় রিসোর্ট সেন্টার “মেঘলা”
হয় না বটে মেঘের খেলা
সদা বসে পর্যটন মেলা ।
পাহাড় বুকে হেলেদুলে
রবি রশ্মির মৃদু আভা
সারি সারি আম্র কানন
পাহাড় দেশের প্রীতিশোভা।

চোখ ধাঁধাঁনো রম্নপের বাহার
জুড়ায় মন-প্রাণ
আকাশ ছোয়াঁ পর্বত রাজি/মালা
অকৃত্রিম প্রকৃতির দান।
নীল গিরি , নীলাচল , চিম্বুক আর মেঘলা
আরও কত শত সুমিষ্ঠ নাম
শত জনমের রম্নপের রানী
‘মিজ আদিবাসী হিলট্র্যাক্টস বান্দরবান”।

পাহাড়ের হৃদপিন্ড শঙ্খ,মাতামুহুরি
খরস্রোতা, সতত বহমান
দেশ ও বিদেশের পর্যটকদের
চির কালের আকর্ষণ ।
পাহাড় দেশের রম্নপের যাদু

তুমিই তো এ দেশের হিমালয়
রম্নপে তোমার মুগ্ধ হয়ে
কবি বনে যায়।
তোমার স্ত্মন্যে আজন্ম লালিত
সহজ সরল ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা
জীবন তাদের ঝুকিঁপূর্ণ,
পড়ে আছে অসহায়;
হৃদয় রাজন গুমড়ে কাঁদে
গেথেঁ রয় স্মৃতির কল্পনায় ।

লালন কান্তি চাকমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও শিক্ষক কাজলং মহাবিদ্যালয়।

অনুকনা চাকমা

জীবন তো এটাই

নীরব, নিস্ত্মব্দ রাতের পরে,
ফুরফুরে মেজাজে,
একটা সুন্দর সকাল দেখার আশায় বেঁচে থাকা,
টিনের চালে বর্ষার,
প্রথম বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের অপেক্ষায় বেঁচে থাকা,
আশ্বিনের উঠোনে সাদা জামা,
আর কমলা রঙের পা-জামা,
পরা শিউলির মত রঙিন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা,
ঘাসের, ডগায় শীতের শিশিরে,
পা ভিজিয়ে ঘাস ফরিঙের,
লাফালাফির মত আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকা,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাতে,
ভরা পূর্ণিমার চাঁদের অপরূপ,
সৌন্দর্য্য দেখার জন্য বেঁচে থাকা,
এটাই তো জীবন-
আমি রাতের নিঃসঙ্গতার কাছে বাঁচতে শিখেছি,
চাঁদের একাকীত্বের কাছে একাকী হাসতে শিখেছি,
বৃক্ষলতার নিরবতার কাছে সজীবতা পেয়েছি,
আর কি চাই, জীবন তো এটাই।

অনুকণা চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, রাঙ্গামাটি ।

কবিতা চাকমা

কল্পনা চাকমা

পুলিশ তদন্ত্ম এগুবে কি করে ?
যদি না নিখোঁজ জন মূল সাড়্গী হয়ে
তার নিজ অপহরণের সাড়্গ্য দিতে না পারে
কল্পনা চাকমা নিখোঁজ তদন্তেত্মর
এই হলো পুলিশ সুপারের রিপোর্টের উপসংহার।

সামান্য এক নারী কল্পনা, সে জাতি নয়, উপজাতি
উপজাতি খোদাই হয়ে আছে জাতীয় মহা-বয়ানে
এটা কোন ব্যাপার নয়, ১২ই জুন ১৯৯৬সালের প্রথম প্রহরে
নিঃসার অন্দকারে বন্দুক তাক করে নিজবাড়ী থেকে অপহরণ।

অন্ধকার লাল্যেঘোনা,
কাপ্তাই লেকের পাড়ে এক অজপাড়া গাঁ।
লেকটা বানানো হয়েছিলো বৈদ্যুতিক বাতির জন্যে
বেশ আগে, কল্পনার পূর্ব প্রজন্মের ভিটেবাড়ী ডুবিয়ে।
কল্পনাকে অপহরণ করেছিলো তারা
বিধবা বাদনী, অন্ধপ্রায়, কৃশ, বৃদ্ধ মমতাময়ী মা,
আর চারন্নবালা, কল্পনার লাস্যময়ী, মায়াবতী, বৌদির বুক ছিনিয়ে,
সাথে অপহৃত হয়েছিলো স্নেহদাতা কল্পনার দুই ভাই,
কালিন্দী ও ড়্গাদিরাম।
ওদের দু'হাত ছিলো পেছনে টেনে বাঁধা।
ওদের চোখও ছিলো কাপড়ে বাঁধা।

ওদের ঘর থেকে টেনে নেওয়া হলো।
ড়্গাদিরামকে নির্দেশ দেওয়া হলো সম্মুখে হাঁটতে

হোঁচট খেল সে লেকের হাঁটু জলে
যখন নির্দেশ এল তাকে গুলি করার
ঝাঁপ দিলো সে লেকের আশ্রয়ে
কালিন্দীও দৌড় দেয় গুলি শব্দে।
গুলির কানফাটা আওয়াজ তুচ্ছ করে
শোনা গিয়েছিলো কল্পনার আর্ত ডাক দাদা, দাদা।

অভিযুক্তরা জাতি ভূক্ত
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও চামচা।
সাক্ষী তার দুই ভাই
যারা চিনে ফেলেছিলো কিছু অপহরণকারীর স্বর,
অপহরণকারীর আনা টর্চের আলোয় তাদের কিছু মুখ,
লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস খানেরও নুরন্নল হক, এক সেটেলারের।
তদন্ত্ম রিপোর্টে ভাইয়েরা মূল সাক্ষী বলে গণ্য নয়,
রিপোর্ট বলে, কল্পনা, নিখোঁজ জনই, মূল সাক্ষী।
কি দরকার এসব নিয়ে চিন্ত্মা করার ?
এখন একবিংশ শতাব্দী
১৯৯৬ সাল সুদূর অতীত।

চুলোয় যায় তোমাদের শব্দাবলী,
চুলোয় যাক তোমাদের বিবেচনা,
চুলোয় যাক তোমাদের নৈতিকতা,
চুলোয় যাক তোমাদের মানবিকতা,
চুলোয় যাক সম্পাদকরা,
চুলোয় যাক লেখকরা,
চুলোয় যাক কবিরা,
চুলোয় যাক সাংবাদিকরা,
চুলোয় যাক প্রতিবাদীরা,
চুলোয় যাক বিচার অন্বেষীরা,
চুলোয় যাক, চুলোয় যাক সব।
এখন কল্পনা কর কল্পনাকে
সে এক মহীরন্নহ নারী,
না, না এ মিথ্যে,
সে নারী নয়,

সে মানুষ নয়,
সে অমানুষ।
এক মানুষ উর্ধ্ব
বা মানুষ নিম্নজীব।

সে নিখোঁজের রাজ্য থেকে তার অপহরণকারীর অস্ত্র গুড়িয়ে
পুলিশের কাছে এসে তার নিখোঁজের মূল সাক্ষী হতে পারে।
হয়তবা এমন ক্ষমতাও আছে তার, মৃত্যুর পর জ্যান্ত্ম
ফিরে আসার, যদি কখনও তাকে হত্যা করা হয়।

একুশ বছরের এক তরন্নণী,
অজানা সম্ভাবনার এক নারী।
এক শিক্ষার্থী।
এক পরম বন্ধু।
এক যোদ্ধা।
এক সাধারণ।
সব পরিচয় ফেলে তার পরিচয় আজ নিখোঁজ।
কিন্তু দুর্দান্ত্ম বিদ্রন্নপের খোঁচা চষে
উন্মাদ দানবের ভয়াল হাসি হেসে
ও যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম পাহাড় আলোকিত করে আগুনে
আর বাংলাদেশের বিস্ত্মীর্ণ স্থলভূমি বন্যায় ভাসিয়ে পুষ্ট করে পলি উপত্যকায় বছরের পর বছর...।
কি স্পর্ধা তোমার, বেহায়া, তুমি আমাদের হৃদয় ভাঙো
কি স্পর্ধা তোমার, বেপরোয়া, তুমি বিচার প্রহসনে প্রশ্ন করো
কি স্পর্ধা তোমার, নির্লজ্জ, তুমি আমাদের নৈতিকতায় আঘাত করো
কি স্পর্ধা তোমার, কলঙ্কিনী, তুমি আমাদের মানবতাকে লজ্জিত করো
কি স্পর্ধা তোমার, অবিবেচক, তুমি জাগিয়ে দাও
ন্যায় বিচারের আকাংখা।

কল্পনা চাকমা, তোমাকে আমাদের ভালোবাসা,
তুমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কালিমা,
তুমি অন্যায়ের বিরন্নদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ ভয়।

কবিতা চাকমা, বিশিষ্ট কবি, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া।

হ্লাপ্রুসাইন মারমা (সাইন)
চেতনা উদ্দীপন

সভ্যতার বিকাশের পৃথিবীর রূপ বদলে যায়
তার সাথে সুশিক্ষিত জাতিরা উন্নতি পথ ধরে
জীবন যাত্রমান দিন দিন বদলে দেয়
সব দিকে পিছিয়ে থাকা কোন এক জাতি
সভ্যতার বিকাশের পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগে
তাদের উন্নতির অগ্রযাত্রা পথ সৃষ্টি হবে?
সবার মাঝে নব চেতনা উদ্দীপন বিকশিত হবে?
নাকি বাঁধা বিঘ্ন হইয়ে
আরো অনেক দূরে পিছিয়ে যাবে।
যার কারণে সেই জাতির উন্নতি পথ দেখতে
আরো কত যুগ অপেক্ষা থাকতে হবে?
আমার দৃঢ় বিশ্বাস সবার মাঝে এক জলক
নব চেতনা উদ্দীপন সৃষ্টি হবে অতি শ্রীঘ্রই
তাদের উন্নতির পথ দেখতে পাবে।

হ্লাপ্রুসাইন মারমা(সাইন), লেখক-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মারমা সংস্কৃতি সংস্থা (মাসস) গবেষক ও উন্নয়ন কর্মী, বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি।

হারাধন বৈরাগী
ডুঙ্গুর

(বিদ্র: ১৯৭০ সালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রুপায়ন কালে একটি ভালবাসার সলিল সমাধিকে মনে রেখে-)

উত্তুঙ্গ দু' টিলায় দুটি জুম-মাঝ
বরাবর চেঁচেঁমা রাজায় উদাস দুপুর।

জলঙ্গঁ ডাকে উ-ই-ই-উ-ই-ই
খোসাব জড়ানো নিঝুমপুর।
শিপিং গাছ ঘুরন্নৎ ঘুরন্নৎ ঘুম খুঁজে
হামচো গাছ ফুরন্নত ফুরন্নত বুল বুল-।

বাজতে থাকে ওয়াকপক-
বাজতে থাকে ওয়াকপক।

ঝলসে উঠে মাথিয়া
চমকে উঠে তকিরায়

বেজে উঠে মোহনীয়া সুমু
সুর কেড়ে নেয় সুমালিয়া হৃদি
ঝরতে থাকে হৃদয়পুর।

ফুঁসে ওঠে জল-ওপার অতল
ফুঁফিয়ে ওঠে ডুঙ্গুল ঘর-
হান্ত্মিপাতিল বিছানা পত্তর-।

ফরমান নিয় ঘর-ভাঙে মায়ুং
সাইমাতি ডাকে-অভয়-আশ্রয়
কালাঝারি-তকিরায়-রাঙাঝারি।

জলার দু'পার ধরে ভাসানের জঙ্গল
নীড়ভাঙা নবোঢ় এক উলস্নুক দম্পতি
হতবিহ্বল-দু'পার দেয় আশ্রয়।

উলস্নুক ডাকে উ-হু-উ-হু
উলস্নুকি উ-হু-উ-হু পুরো তিনটি বছর।

কেবল বরাবর ঢেউ ভাঙে
ঢেউএ ঢেউএ চং প্রেঙের ঝড়।

বিদ্র: **চেঁচেঁমা**- ঝিঝি পোকা
শিপিং-তিল
হামচো-মরিচ
ওয়াকপক-ভটভটি/বাঁশ তৈরি পাখি তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
মাথিয়া- বালা,
সুমু- টিপরাই বাঁশি
মায়ুং- হাতি
চংপ্রেং- প্রেমের বিরহবাদ্য

হারাধন বৈরাগী , বিশিষ্ট কবি , ত্রিপুরা , ভারত।

সাগরিকা চাকমা

ব্যার্থতা

একি চেয়েছিল তোমার মাতা-পিতা
আনন্দের পরিবর্তে অপ্রত্যাশিত ব্যাথা।
যাহা তোমাকে প্রদান করেছেন,
যাহা তোমার নিকট চেয়েছেন।
দিতে আসলেই কি তুমি পেরেছো-
কি, হয়তো বলবে জানি, হ্যাঁ।
কিন্তু আসলেই কি তুমি পেরেছো ?
শিক্ষাগুরূন্ন তো তোমাকে শিক্ষা অনেক প্রদান করেছেন!
কিন্তু তুমি আসলেই কি স্বশিক্ষিত,
জানি এক পর্যায়ে গিয়ে বললে
পুরো হয়তো পারিনি।
আসলেই কি এটা চেয়েছিল তোমার শিক্ষাগুরূন্ন ও মাতা-পিতা
আনন্দের পরিবর্তে অপ্রত্যাশিত ব্যাথা
নাকি এও তোমার ব্যার্থতা ?

সাগরিকা চাকমা , শিক্ষার্থী , রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ , রাঙ্গামাটি ।

রবি শংকর চাকমা

জাতীয় পরিচয়

জাতীয় পরিচয় সাংস্কৃতিতে
পথ প্রদর্শক হয় রাজনীতিতে
পাশা-পাশি ভাই, ভাই,
একতার শক্তিতে হাত বাড়ালে
জাতীর কল্যাণ হয়।
প্রতি হিংসা রাজনীতিতে
জাতি লিপ্ত করতে চাই,
এসো সবাই এক গাছের ডাল-পালা হয়ে
পরিপক্ষ ফল ফলাতে চায়।
ভাগা-ভাগি হবনা আর
এই করি প্রতিজ্ঞা।
আত্ন রক্ষায় আত্মনিয়ন্ত্রণ
করি প্রতিষ্ঠা
অধিকারে মূল্য বোধ
রাজ-নীতিতে বলে,
অধিকার হারা জাতী
ছত্রাক জনিত ঘাসের মতো
মাটিতে লুতে পড়ে।
শক্ত হাতে ধরবো আমি
জাতির কল্যাণে মরবো
মরেও অমর হতে চাই
ইতিহাস গড়বো গড়বোই।।

রবিশংকর চাকমা, উদীয়মান কবি, রাঙ্গামাটি।

রূপেন্দু বিকাশ চাকমা

স্বর্গীয় কবি চিত্র মোহন

পার্থিব জীবন, একা নব্বই বৎসর চলার পতিতে
বাইশ শে মার্চ দুই হাজার ষোল সালে;
রোজ মঙ্গলবার দুপুর একটা পয়ঁতালিস্নশ মিনিটে
পৃথিবীর বুকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে,
সামাজিক সমস্ত্ম বাধঁন ছিন্ন করে
তুমি চলে গেলে এক অদৃশ্য জগতে।
তুমি যেখানে থাকো না কেন সুখে শান্তিস্মতে থাকো
ইহা আমার একমাত্র কাম্য।
তোমার দেহ নয়নের দৃষ্টির অগোচরে হলেও
সহস্র ভক্ত ও শুভকাঙ্গির হৃদয়ের দুয়ারে
তুমি থাকবে চির জাগ্রত।
জুম্ম জাতির সাংস্কৃতির অঙ্গনে
তুমি ছিলে মহান গৌরব গাথা।
খবরের কাগজে ও বইয়ের পৃষ্ঠাঙ্গনে
তোমার ঠিকানা থাকবে অক্ষয়রূপে।
তোমার ছিল অপরিসীম কবিত্বের প্রতিভা
একমাত্র আর্থীক দৈন্যতার কারণে
তোমার প্রতিভার অঞ্চলা আলোকিত হয়নি।
তবুও জুম্ম জাতির সাংস্কৃতিক আলয়ে
তুমি থাকবে চিরদিনের জলন্ত্ম শিখা।
অভিশপ্ত জাতিতে জন্মান্ত্মরের কারণে
তুমি পাওনি যথার্থ স্ব-মূল্যায়ন।
তাই তোমার বিদায়ী আত্মার কাছে
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ-শ্রদ্ধার সহিত ব্যক্ত করছি।
আমার আত্ম উপলব্ধির গলানি।
আর্শীবাদ করো মোদের
যেন তোমার জ্ঞানের আলো হয়।

সকলের চলার দিশারী।

রূপেন্দু বিকাশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

অরন্নমিতা চাকমা

ভেঙ্গেঁ অংশিত জীবন

আমি কি শুধু গন্ধে সুনির্মল?
জ্ঞানে বলো গালে বলো শস্য ক্ষেতে কে?
আলোতে অন্ধকারে রূপে আর ঐশ্বর্যে,
ভালোবাসার মহাসাগর যেখানে বেদনার যুগ চির স্নান
শাসন শক্তি মায়া ভরা রাতে
একটি সুখের নীড়, গালিচা বহু রঙে রঙিন
পরশে আবেশে ধুয়ে যায় যত গস্নানি।
চিনতে পারে কি আমায়?
আমি যে হৃদয়হীন চোখের কাজল
বেশুরা মনের মশাল
পাশে থাকা বিশ্বাস।
আমি কি শুধু মমতার নিপুন সংস্কারে
তোমার সমাজ সংসার অটুট বন্ধন
বিসর্জিত জীবন অস্বীকার গৌরব
জয়ের মালা ছিড়ে যাবে উৎকণ্ঠিত হবে জয়গান
লব্দ কীর্তি হবে মাটির থালা
লুটিয়ে পড়বে পলস্নবিত্ত।

অরন্নমিতা চাকমা, বিশিষ্ট কবি খাগড়াছড়ি।

মনোরঞ্জন চাকমা

পরীক্ষার হল

পরীক্ষার হল
নাই কোন কোলাহল
হাতে যখন প্রশ্ন আসে
কেউ খুশি
কেউ জ্লান
তখন কারো হাত খাতায়
কারো হাত মাথায়
কারো হাত মাথায়
কলমের খস খস
খাতায় খস খস
অনেকে লেখি অবিকল
কারোর চোখ ছল ছল
ঘন্টা যখন বাজে
মনটা উঠে কেপে
খাতা যখন হাত ছাড়া
মনে পড়ে সব পড়া।

মনোরঞ্জন চাকমা, বিশিষ্ট কবি, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

সুশীল বিকাশ চাকমা

মিনতি

শঙ্খ-মাতামুহুরী-চেঙ্গী-কাচালং-কর্ণফুলী!
এমনতো হবার কথা ছিল না! ছিল না! ছিল না!
চারদিকে দাবানলে মানবতা পুড়ে হয়ে যাচ্ছে ছাই
পাহাড় পর্বত, বন বণানী-
যেখানে জুম্মদের মেলে কিছুটা ঠাঁই।

শঙ্খ-মাতামুহুরী-চেঙ্গী-কাচালং-কর্ণফুলী!
তোমরা মূর্তির মতন চেয়ে আছ কেন?
দিতে পার না ঢেলে তোমাদের বুকভরা জল?
নিভে যাক দাবানল, বেঁচে যাক প্রাণিকূল;
গজে উঠুক সবুজ ঘাস, গাছ-গাছালি,
বেজে উঠুক পাখিদের কল-কাকলী।

শঙ্খ-মাতামুহুরী-চেঙ্গী-কাচালং-কর্ণফুলী!
তোদের চরণ তলে কর জোড়ে করি মিনতি,
জেগে চেয়ে দেখো- নরককুন্ড দাবানল।
অকালে পুড়ে যাচ্ছে শত রক্ত গোলাপ-
গন্ধরাজ, পাহাড়ের সপ্ত রঙের ফুল আর কেতকী।

সুশীল বিকাশ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, সাংস্কৃতিক কর্মী, রাঙ্গামাটি।

চাঙমা গীদ

পঠন চাকমা

মোন মুরো তারন্নম বন

মোন মুরো তারন্নম বন আমা এ দেশ্চান
চের কিত্যা ছরা গাঙ গম লাগে ভঝমান
উরি উরি পেক্কুনে নানান গীত শুনান
ও মানে লগ সুগে থাগ’ গীদ সুরে কই যান ॥

পেগ ডগরন চিংচিং গাঝ’ দেলায় দেলায়
দিন কাদে দিই ঝাগে ঝদায় ঘিলে নাদেঙ খারায়
পিবির পিবির বৈয়েরে গাঝ’ পাদা ঝরি যায়
সে পাদানী কুরেই যেই মন সুগমায় ॥

ঘরক্কুনে গরন্ন সরান জম’ রান্ন্যয় রান্ন্যয়
বাজি বেই বেই রেঙে গিদে ফিরন সাঝন্যায়
রেত্তো এলে নানান ফুলে তুম্বাঝ সিদি যায়
সে তুম্বাঝে আমা মন সুগে ভরি যায়।

পঠন চাকমা, বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও সদস্য, জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি।

রীএলি চাকমা সুজল

এলং, আঘী, থেবং

আমি এলং, আমি আঘী'
থেবং আমি আহ্ঝি মাদী'
হেবং বেগে ভাগে-জুগে'
নচেবং আমি থেয়্যা-নেয়্যা ॥ঐ॥

ফাগুন' মাঝত ফুল ফুদিলে
কোচ্পানা'নি ঈদত উধে'
জীবনানী স্বর্গর রেজ্যো বানেই
দি'যেবং পিথিমীত হুজি ছিদি
থেবং আমি আহ্ঝি মাদী'
নচেবং আমি থেয়্যা-নেয়্যা ।॥ঐ॥

জ্ঞ্যান বিজ্ঞানলই কহ্ধা কবং
নুও নুও জিনিস্ বানেবং
মানেই কুলত যিয়ানি লাগে
জাদ ভেয়ত্তুন আমি পেবং (২)
নিজ' পথান ধুহ্ রাগেই
আদিবং কাররে দুষ্ ন'দি
নচেবং আমি থেয়্যা-নেয়্যা ।॥
আমি এলং --------- ভাগে জুগে ॥ঐ॥

রীএলি চাক্মা সুজল, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, রাঙ্গামাটি।

অনুকনা চাকমা

আঝি আঝি মু গুরি

আঝি আঝি মু গুরি মুরা ছেরেত্তুন,
রাঙা ছদগে বেলান উদের জাগার ঘুমত্তুন,
উদ অ উদ অ ভেই বোন লক,
বেলান গরের ঝক ঝক,
ইচ্চা আমা বিজু দিন,
বজর অ মাধাত ইক্ক দিন,
দাগদন পেক্কুনে,
বর মাগি বেক্কুনে,
নুয়া দিনর নুয়া আঝায়
দিনুন যেন গমে দালে কাদি যায়।

অনুকণা চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, রাঙ্গামাটি ।

কিশলয় চাকমা

চেরবো দেজর গীদ

(এক)
আয় চিজি গেলে আয় চেলে ন্যুঅ জুম
জুমো লেজাত শীল সাদারা দেবে ছড়াথুম ॥

অজল-নিজোল মুরোমুরি শুনি পেবে মরমরি
পেগ' গীদে সুর উদিবো যেব' বুক্ক তর ভরি
চিজি তুই আয়না যাদিমাদি আয়না
কদক আর যেবে ঘুম
জুমো..... ছরাথুম ॥

গাবুর লগর রেঙোচাক নানা পেগর কিজিক-কাজাক
সনা রং দ্যুঅ মিলি উড়োন ঝাগেঝাক।
নন্যে শীলো কুঅ পানি-জুড়েই দিবো পরানানি
মিলেগুনে লবাক হরত খুম
জুমো ..... ছরাথুম ॥

(দুই)
তৈপুদি ছৈপুদিকনে কুদু আগ' তোন তগা যেই
কেল্যে এযের বিজুদিন খুজি উনো নেই ॥

চিগোন-দাঙর, গুরো-বুড়ো হ্াদে হ্াদ ধুরি
মিলে-মরদ এক সমারে লবং আদাম ঘুরি
কিয়্যে গেবাক উবোগীদ- কিয়্যে দিবাক রেং
কিয়্যে যেবাক নিচিদে বাঁজি বেই বেই
হুজি উনো নেই।।

ঘিলেখারা নাদেং খারা অবং জিদেজিদ
বিজু পেক্কো ডাগি ডাগি জুরেই দিবো চিদ
পাজন তাজন পেলে খেবং - খেবং সান্যে পিদে
কিয়্যে মাত্তল অবাক আরো মদ জগরা খেই
হুজি উনো নেই ৷৷

(তিন)
হাজার হাজার মুরোমুরি হাজার চোগর স্ববন,
হাজার কধায় তুবোল উদে হাজন হাজার জন
নাজন মানুজ জন।।
উবোগীদে বুক ভুরি যায় রেং উদেদে ভারী
যেবার ন'চেই কন' দেঝত এ দেচ্ছান ছারি
মুরো আগে ছড়া আগে
ফুল ফুদি যান দগেদাগে
হাজার পেগে ডাগন ৷৷

তের' জাদর বসত ইদু তের' গাজর ফল
মা-বো কধায় উদিই বুজিই মা-বো আমা বল
রেত্তো এলে জুনো পহ্‌রে- অলি ডাগন ঘরে গরে
হাজার উড়োন।।

(চার)
মনে মনে দ্যা মিলি চাং
দ্যুঅ মিলি উড়ি উড়ি ঘুরি মুই যাং
তুওদ' ন' পেলুং- তুও দ' ন' দেলুং
ম' দেশ্চান' সান
হিল চাদিগাং ওমর হিল চাদিগাং ৷৷

এই দেঝত জনম লোই মুই দ' ভারী সুগী
ধান ভুয়ানি রিঙি চাংগে লুগি লুগি
মন ভরেদে বুক জুরেই দে
দেগেদে স্বর্গসান ৷৷

মুরোমুরি ছড়াছড়ি চেরকিত্যে তারাসবন

গাঝে বাঝে নানান পেগে আমিজে ডগরন
ফায়োন এযেদে ফুল ফুদেদে
উদেদে রাঙা বেলান ৷৷

....
কিশলয় চাকমা, বিশিষ্ট কবি, গীতিকারও উন্নয়ন কর্মী খাগড়াছড়ি।

তরুন আলো চাকমা
সুরঃ রতন ত্রিপুরা

যদি পিত্থিমীত

যুদি পিত্তিমীত মুই বাজি থাং
তর আঝালোই অব বাজি থানা
মুই যুদি হনদিন সবন দেগং
সবনানি তরে লোই অব দেগানা।

জীবনর দুগোর হধা
বেগ তরে ভাঙি হোয়োং
ম' সুগোর সবনানি
বেগ তরে নিনেই দেক্‌খোং
তুই এলে মর এ জীবনত
আওজোর হোচপানা।

জীবনর এ হোচপানা
এজ' আগে ম' বুগোত
তর মর সুগোর দিনুন
এজ' ভাজে দিচোগোত
তরে ছাড়া মর হিঙিরি অব
এ পিত্তিমীত বাজি থানা।

তরুন আলো চাকমা, বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার, রাঙ্গামাটি।

কথা ও সুর : স্মৃতি জীবন তালুকদার

বিদেয়র গীত

এক সমারে আঝি রঙে
মিলিমিঝি থেই॥
পরানান হেযান গরের
ফেলে যাদে -ঐ
আঝি রঙে পিত্থীমিয়ান নাজেই তুলিদোং
ইংজে পিজুম ন-এল ন-এল ভর
হদ হদা উদের-পরের এ মনানত
চোগাত ভাজের সেদিনুন বানা বানা মর॥
উরন্ন উরন্ন মনান মর হেযান পাঙর ঐ
আবিদ্যেনে ভুল অই থেলে হেমা গরি দোঅ
জীংহানি যেন সুগে যায় তিরোজ গুরি দোঅ
রঙে রঙে ভরি উদোক দুগর জীংহানি
মেউল হাদি যেই ফুদোক বেল পহর
যেবারহালে তমা বেগর হোচপানানি
ঈদোত থেব জনমান মনানত মর॥
আর দেখা অয় যেন বর মাগঙর-ঐ।

স্মৃতি জীবন তালুকদার, শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

ছোটগল্প

বিপম চাকমা

পিনোন-হাদি

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

ব্যাপারটা একদম হাস্যকর পর্যায়ে এসে ঠেকে গেল। তালুকদার বাড়ির মেয়েরা এখন হন্য হয়ে এর ওর কাছে ধর্না দিচ্ছে। কথাটা শুনে অন্যেরা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো। -কেন?

আর কিছু নয়, তাদের দরকার একজোড়া করে পিনোন হাদি। পিনোন চাকমা মেয়েদের উর্ধ্বাঙ্গের এবং হাদি নিম্নাঙ্গের পরনের কাপড়।

তো মেয়ে বুকে কাপড় বান্ধার উপযুক্ত হলেই পিনোন হাদি লাগবে, এতে হাসার কী আছে? কিন্তু এ চাকলায় কথাটা ছড়াতেই মানুষজন যেন একসাথে অট্টহাসি দিয়ে উঠলো। বিশেষ করে হাসির উপলক্ষ্য যখন তালুকদার বাড়ির মেয়েরা।

আশপাশের গ্রামের মেয়েরা খবরটা শুনে প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার পর বিষয়টা খোলাসা হতেই অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়ল। চারিদিক থেকে ছুটে আসা হাসির গমক যে তালুকদার বাড়িতে লাগে নাই তা নয়, বেশ ভালই লেগেছিল। না হলে কথাটা ছড়ানোর সাথে সাথে প্রথম দিকে হাসির যে ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গিয়ে ছিল তাতেই কেন তারা গুটিয়ে যাবেন? তালুকদার গিন্নি প্রথম দিকে যাকেই সামনে পেতেন মরিয়া হয়ে তার আর্জিটা জানাতেন কিন্তু যেই না হাসির প্রথম ঢেউটা এসে গায়ে লাগল তখনই তিনি গণহারে আর্জির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে চুপিসারে সম্ভাব্য আর্জি রক্ষাকারীদের কাছে যেতে লাগলেন।

একেতো তালুকদার তার উপর বাজার চৌধুরী, এ দুই আভিজাত্য সূচক পদবীর চাপে তালুকদার গিন্নির নাকটা অন্যদের চেয়ে একটু উঁচু ছিল। তারা সমাজে বেশ বাছবিচার করে চলা ফেরা করতেন। কার সাথে মেশা যাবে কার সাথে যাবে না। কি করা যাবে কি করা যাবে না। কি পরা যাবে কি পরা যাবে না ইত্যাদি বিধি-নিষেধ তাদের নিত্যকার জীবনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে তাই তালুকদার বাড়ির মেয়েরা নিজেদের চৌদ্দপুরুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে শাড়ি পরা শুরু করেছিলেন। আর তারা বলে বেড়াতেন পিনোন হাদি পরে গাঁইয়া মেয়েরা। আভিজাত্যের লক্ষণ হচ্ছে শাড়ি পরা এবং

পরতে জানা। সুতরাং এ তলস্নাটে যারাই কোন উপলড়্গে নিজেদের আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতো তারাই প্রথমে ছুটে আসতো তালুকদার বাড়িতে। হয়তো শাড়ি ধার চাইতে নয়তো শাড়ি পরা শিখতে। এতে তালুকদার গিন্নির বুকটা গর্বে ফুলে যেত। তিনি অভিজাত হিসেবে সমাজে তার অবস্থানটা কোথায় তা আরেকবার দেখতে পেতেন।

একদিন বিকেলে পাশের বাড়ির সাধনা বালার কাছে বেড়াতে গিয়ে তালুকদার গিন্নি পিনোন হাদির প্রসঙ্গটা তুললেন।

-বোন থাকলে আমাকে একজোড়া পিনোন হাদি দাও না।

তালুকদার গিন্নি তার কাছে পিনোন হাদি চায়, কথাটা শুনে সাধনা বালার কাছে প্রথমে অপরিচিত ঠেকে। মনে হয় অচেনা বাক্যটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা এবং সে আধো আধো শুনলো।

সে একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো - কেন, কার জন্য?

-আমার জন্য বোন আমার জন্য।

-কেন তোমরা না শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পর না? সাধনা বালা আমতা আমতা করে উচ্চারণ করলো। কথাটা বলতে বলতে চিন্ত্মা করতে লাগলো, আবার কিনা তালুকদার গিন্নির আঁতে ঘা লাগে।

-আর বলো না বোন বিপদের মধ্যে আছি।

সাধনা বালা বুঝতে পারে না কিসের বিপদ আর কিসের আপদ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তালুকদার গিন্নি বলতে থাকে- জান না, দেশে যুদ্ধ শুরম্ন হয়ে গেছে। রাঙ্গামাটিতে পাঞ্জাবী আর্মি এসে ভরে গেছে। পাঞ্জাবীরা যাকে পাচ্ছে তাকে ধরছে। লোকজন ভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরাও রেহায় পাচ্ছে না। তবে পিনোন হাদি পরা থাকলে তাদেরকে নাকি ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের এদিকেও যে কোন সময় চলে আসতে পারে। ভয়ে কোথাও যেতে পারছি না।

সাধনা বালা এতড়্গণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ঘরের চাল থেকে ঝুলতে থাকা তাদের কাপড় রাখার বাঁশটি দেখিয়ে দিয়ে বললো- এই যে ভাবী, আমার পিনোন এ কয়েকটাই। এগুলো দিয়ে আমি জুমে যাই ড়্গোতে কাজ করি। এ ছেড়া কাপড়গুলো আপনারা পরতে পারবেন না। ভালো বলতে পিনোন আছে একটামাত্র। যেটা আমার বাজারে যাওয়া বা কোথাও বেড়াতে যেতে লাগে।

তালুকদার গিন্নি কাতর স্বরে সাধনা বালার হাত ধরে বললো- ওটাই দে বোন টাকা যা চাস দেবো।

সাধনা বালা আঁতকে উঠলো- না না ভাবী ওটা কিছুতেই দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ওটা ছাড়া আমার ভাল আর কোন পিনোন নেই।

তালুকদার গিন্নি আরেকটু চেপেচুপে ধরলো- দে বোন, না করিস না। তোরা বুনতে জানিস আরেকটা বানাতে পারবি। আমিতো এতো দিনে কাপড় বুনাই ভুলে গেছি।

সাধনা বালার পড়্গে এ অনুরোধ রাখা কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না।

সে বললো- জুমে গিয়ে আছাড় খাওয়ার পর থেকে কোমরে ব্যথা। কয়েক বছর ধরে কাপড় বুনতে পারি না। বাদি মিলা মা'কে বুনতে দিই। আপনি বরং তার কাছে যান।

তালুকদার গিন্নি বুঝলো সাধনা বালার কাছ থেকে পিনোন পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যার কাছে একটামাত্র পিনোন আছে সে সেটা কিভাবে আরেকজনকে দিবে? ব্যাপারটা বুঝলেও সে একটু বিরস মুখে ব্যর্থতার গস্নানি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলো।

সাধনা বালা বাদি মিলা মা'র কথা বলেছে। তালুকদার গিন্নি চিন্ত্মা করতে লাগলো, তার কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি না। বাদি মিলা মা এর ওর কাছে দিনমজুরি করে আর অবসর সময়ে টাকার বিনিময়ে কাপড় বুনে দেয়। সমস্যা এটা নয়। সমস্যা অন্য জায়গায়। ছয় মাসও হয় নি, এ মহিলাকে তালুকদার গিন্নি চুরির অপরাধে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন কিনা তার কাছে গিয়ে পিনোনের জন্য ধর্না দেয়া?

তালুকদার গিন্নি প্রস্ত্মাবটা বাদ দিয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে পিনোন হাদি সংগ্রহ করা মনঃস্থ করলেন।

কিন্তু কোন বাড়ি থেকেই সংগ্রহ করতে পারলেন না। কেউ কেউ কাপড় থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছে করে দিলো না। কারণ তারা তালুকদার বাড়ির আভিজাত্যের গর্ব এবং তার দাম্ভিক-চর্চা নিয়ে তাদের উপর বিরক্ত ছিলো। তারা ভাবলো এবার জব্দ করার একটা মওকা পাওয়া গেছে।

শেষ পর্যন্ত তালুকদার গিন্নি বাদি মিলা মা'র কাছে গেলেন। বাদি মিলা মা তখন একটা পিনোন বুনায় ব্যস্ত। পিনোনটি তাদের গ্রামেরই সোভাগ্য লালের বউ বুনতে দিয়েছে। কাপড়ের সুতোও তার কিনে দেয়া। বাদি মিলা মা কেবল বুনে দিবে। বিনিময়ে কিছু টাকা পাবে। এক নাগারে বুনতে পারলে দু'তিন দিনে শেষ করতে পারবে।

কাপড় বুনতে বুনতে বাদি মিলা মা'র হঠাৎ চোখ গেল তাদের বাড়ির ইজোরের(বাড়ির সামনে সম্প্রসারিত বাঁশের মাচাং) সিঁড়িতে। তালুকদার গিন্নি শাড়ির আঁচল উঁচিয়ে লাগারা বাঁশ(আড়বাঁশ) ধরে উঠে আসছেন। দেখে প্রথমে সে একটু অবাক হল। তারপর মনের ভেতরে এক ধরনের আতঙ্ক তাকে চেপে ধরল। তালুকদার গিন্নি তার বাড়িতে! উদ্দেশ্য কী? কোন মতলব নেইতো? চুরির অপবাদে নিঃগৃহীত হওয়ার দগদগে স্মৃতি এখনও তার মনে আছে। সে দিন দরিদ্র বলে তার প্রতিবাদে কোন কাজ হয় নি। তাকে রড়্গা করার জন্য সাহস দেখিয়েও কেউ এগিয়ে আসে নি।

তালুকদার গিন্নি একটু হাঁপান। একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মোছেন। বাদি মিলা মা'র মনে হয়, এসব আভিজাত্যের মেকি ঢং। ফুঃ তারা এত আয়েসী, বাঁশ পরিমাণ রাস্ত্মা হেঁটে আসতে কষ্ট হয়। হাফ ধরে যায়।

আয়েস নয়, আসলে তালুকদার গিন্নির মনের ভেতরে ঘটে চলা দ্বিধাদ্বন্দ্বের লড়াই তাকে এভাবে নাকাল করে তুলেছিল।

তালুকদার গিন্নি তার সমস্যার কথা জানিয়ে বাদি মিলা মা'র কাছে একজোড়া পিনোন-হাদি চাইল। তাকে দেয়ার মত অতিরিক্ত পিনোন-হাদি বাদি মিলা মা কোথায় পাবে? সে সারাবছর অনেক পিনোন বুনে কিন্তু একটাও তার নয়। সবগুলো ফরমায়েসী।

তালুকদার গিন্নি অনুরোধ করে, এখন যেটা বুনছে সেটাই তাকে দিয়ে দেয়ার জন্য। যত টাকা লাগে সে দেবে। বাদি মিলা মা সহজ ভাবে বলে, এটা তার নয় সোভাগ্য লালের বউ তাকে বুনতে দিয়েছে। তালুকদার গিন্নি আর কোন জোরাজুড়ি না করে বাড়িতে চলে যায়।

পর দিন থেকে তালুকদার গিন্নি বাদি মিলা মা'র বাড়িতে এসে বসে থাকা শুরম্ন করল। সারাদিন কাটানোর সরঞ্জাম; পানের বাটা, তামাক আর খানা পিনা সাথে করে। ভাল ভাল কিছু তরকারী রান্না করে নিয়ে আসে। বাদি মিলা মা'কেও খাওয়ায়। সারাদিন বাদি মিলা মা'র সাথে এটা ওটা নিয়ে গল্প-গুজব করে আর দেখে কাপড় কতদূর এগোলো। বাদি মিলা মা বাধ্য হয়ে মাঝে মধ্যে হুঁ, হাঁ করে জবাব দেয়।

তিন দিনের মাথায় কাপড় বুনা শেষ হয়। বাদি মিলা মা কাপড় কেটে ভাজ করে একদিকে রাখে। তালুকদার গিন্নি গুছিয়ে রাখা পিনোন ছট্ করে তুলে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। যেন কাপড়টা তার জন্যই বোনা হয়েছে। 'ধর পিনোনের দামটা' বলে কিছু টাকা বাদি মিলা মা'র হাতে গুঁজে দিয়ে হাঁটা দেয়। বাদি মিলা মা' একদম বোবা হয়ে যায়। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ততক্ষাণে তালুকদার গিন্নি ইজোরের সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরম্ন করেছে। তখন হঠাৎ বাদি মিলা মা'র মনে পড়লো, ছয় মাস আগে চুরির অপবাদে নিঃগৃহীত হওয়ার ঘটনা। ঠিক এই সময়ে কেন এই ঘটনার কথা মনে আসলো সে জানে না। এই মুহূর্তে যে কিছু একটা করা দরকার এ কথা বার বার তার মনে দোলা দিলেও কর্তব্য সে কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে শেষে করম্নণ গলায় বললো- ভাবী, আমি কিন্তু চুরি করি নি!

আবেগে কাঁপা কাঁপা গলার স্বরের সাথে চোখ দিয়ে বুঝি দু'এক ফোঁটা পানিও ঝরে পড়লো।

তালুকদার গিন্নি হঠাৎ এ কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, বাদি মিলা মা বুঝি ভয় পাচ্ছে, পাছে সোভাগ্য লালের বউ না আবার তাকে চোর সাব্যস্ত করে। তাই তিনি সান্ত্বনার সুরে বললেন- না না তোকে চোর বলবে কেন? তোর যে চুরির কোন অভ্যাস নেই একথা আমরা কি সবাই জানি না ? বলবি ডাকাতি হয়ে গেছে। তোর তো ডাকাত হওয়ার শক্তি বা সামর্থ কোনটাই নেই, নাকি ?

আর কোন জবাব শোনার অপেক্ষা না করে তালুকদার গিন্নি তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলেন।

বাদি মিলা মা ফ্যাল ফ্যাল করে তালুকদার গিন্নির গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল। চোখের পানি মুছতেও সে ভুলে গেল।

বিপম চাকমা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

ভিএন চাঙমা

ধূজো

এক

"আহ্ ভগবান, এ বুজ্জে আমা ইদু এধক কিত্যে এযে কিজেনি! ইজু দেই ন'পারঙ্গে। থেঙানি চেলে চাগলক- উহ্রি এযেদে সুলুমুন গাব বাচ্যে- কিয়েত্তুন হর' হর' বাজ নিঘিলে।" মনে মনে অগমান পেই কল' জুনি। ধুম ধুম থেঙ হুচ ফেলেই ডাইনিঙ' গুধিব' টিভিয়েন ঠুস গরি বাঝে দিল'। গেলেস্ন বার' সে বুজ্জে তারা আহ্ঘুনি শলানত যেনেই চাগলক গোরি দি এচ্যে। কমোডটুত চেরোকিত্যে ঘুলাত্তি- চেই ন'পাচ্যে পারা। সেদিন্যে জুনি একাত্যে অগলে।

জুনি মা পুনে পুনে এক্কু আধ বয়স্যে মানুজ ডাইনিঙ' গুধিব'ত সমিল'। মানুচ্যু বেজ লাম্বা নয়, হক গরি আহ্ধে কেনে আর' বাহ্দি লাগে। শিরেবোত ছেই রঙর একথুপ কাঙরক কাঙরক চুল, কন' অক্তত কালা রঙ এল'। মু জগা কালা কালা ধুব ধুব দারি। এহ্ল এক্কু গাব বাচ্যে শিলুম উরি আঘে- গমে রেনি চেলে শিলুম্ম রঙান পল্যেন্দি ধুব এল' ভিলে বুঝ পা'যায়। তালি দিইয়ে এক্কান লুঙ্গি কমরত গুজ দি আঘে।

"বজ, ভুজল্যা বাপ। জুনি বাপে ধ বাহ্রে যেইয়্যা। হক্কে ফিরে ঠিক নেই।"

"অয়ধে অয়ধে।" কোইনেই ভুজল্যা বাপে জুনি ধাগেত্তুন এক্কান চেয়ার টানি বল'।

"জুনিসনা কেজান আগচ? কি সত্তে?" বুরম্নং বুরং ধুন্ধবাজ নিগিলিল' ভুজল্যা বাপত্তুন।

চোগ পিজি পিজি রিনি চেল' জুনি। টুস গোরি টিভিয়েন মারেই দি জগার পারি পারি তাম্মারে কল', "মা..... মর লেঘা শিঘিবের অক্ত অইয়্যা। মুই পরাত বঝঙলেম্নাই।"

সিত্তুন আর' ধুম ধুম গোরি থেঙ হুচ ফেলেই জুনি গেল'গোই। সুদ'মু ওইনে মাধা নিগুরিল' বুজ্জে। বুঝ' গেল' দে জুনি বিষ দেঘেদে বুজ্জে অল'দে এ ভুজল্যা বাপে।

হানক্কন পরে ভাত খেবার অক্তত জুনি মা ডাগে, "জুনি ভাত খেবার অক্ত অইয়ে। ভাত খা-ঘী।"

জুনি এইনে দেগিল' ভুজল্যা বাপে এয'সঙ ঝুহ্রি ঝুহ্রি বোই আঘে। দেঘিনে উধিল'দে সঙ্গা।

"মা, মুই ভাত ন' খেম।"

"কিয়্যা?"

"মত্তুন ভাত ন'রন্নজের।"
"কিত্তেই ন'রন্নজেত্তে? কি কিয়স্যা? রেদোত আভুখধা ঘুম ন' যায়। দ্বিবে খা।"
"কয়পল্যা কোম, মুই ন' খেম?" কোইনে ভাত পইবো এক আঝার মারিল' জুনি। খংগরং গরি ভাঙিনে কয়েক কত্তা অল' চিনেমাদির ভাত পইবো। পটাস গরি জুনি গাল চাবাত তাম্মা দিল' এক চুগোর। জুনি চোক্কত্তুন তেপ্ তেপ্ চোগপানি পরিল'। এহ্ন অক্তত জুনি বাপে লুমিনেই দ্বি-মাইঝির কানা-কুদো দেঘিল'।
"আহ্, তমার কি ওইয়্যা? এধক কি কিজেক সারাহ্-সারিহ্ গরর?"
তা বাপ' র' শুনি ধাবাহ্ ধাবাহ্ জুনি আজা গলম্নগোই। জুনি বাপে পুঝর গলম্ন, "কি ওইয়্যা? ম' জুনিপুক্কুর কি ওইয়্যা?"
"বা.... চা-না... মত্তুন ভাত ন'রন্নজের। মা বলে-ধরি মরে খা বাজে দে। মুই ভাত ন' খেম।"
"ওইয়্যা, ইক্কু ভাত ন'রন্নজিলে ন'খেস। যেক্কে পেট পুরিব' সেক্কে তেহ্ খেস বুঝু। ওইয়্যা .. ওইয়্যা.. ন' কানিসআর।"
শিরেবু তিগুত তিগুত গোরি চোগ পুঝি পুঝি জুনি সিত্তুন গেলগোই।
ব্যাগ্কু চেয়ারানত থোইনে জুনি বাপে তা মোক্করে কল', "আবিরিদ ঝাবিরিদ গুর' উগুরে তুই কিত্তেই আহ্ধ তুল'স?"
"ত' নুনিয়ে ঝি'বো পাত্তে পাত্তে বেচ্ সেরাত্তে। গোরবা মুজুঙে মরে রাগ দেঘেইনে তে বাঝোন এক্কু ভাঙি দিইয়্যা। বানা মেইয়্যা গলেম্ন ন'অয়, অক্ত অক্ত শাসনও গোরা পরে।"
"আহ্ ভুজল্যা বাপ্, হক্কে এচ্যস?"
"এহ্ধ' বিলেম্নন্দি।"
"ভাত খেল', খেইয়াই তে কধা কবঙ।"
জুনিবাপদাগি মাছ্যেছরাকুল্যে। ভালকভিলোন অল' মাছ্যেছরা ইরিনেই রাঙামাত্যেত তারা পরঙ ওয়ন। ভুজল্যাবাপে তারার জ্ঞাতি কুদুম ন'অলেও চিগোনত্তুন ধোরি আঘে তারা ঘরত। তারা ঘরানর আয় বান্দরি যায় বান্দরিবো অল'দে এ ভুজল্যা বাপে। জুনির বাপ্কুল' আদ্যে-বরঙা স্বর্গ অয়ন ইচ্যে ভালোক বঝর অল। তারা আদাম' ঘরান আ কয়েককানি ভুই ভুজল্যা বাপে চেই দে। ভুজল্যা বাপদাগির এক্কুগোরি পুও- ভুজল্যা। অসুখত পোরি পাঁচ বঝর' মাধাত আহ্বেয়ন। বাঁচি থেলে ইচ্যে জুনি পারা অলুন। ইক্যে তারা বানা বুজ্যে-বুড়ি ঘরচোগী। ভুজল্যা বাপ মানুচ্য নীদিবান অলেও ভঝমান ভেলেসা। আহ্ধত তেঙা পল্যে ইজু দ্বি-আহ্ধে উড়ায়। জুহ্ খারা খেলে আ মদ খেইয়াই সোন্দুল অয় পোরি থায়। জেব্ সুদো অলে তেঙা মাগিবেত্যায় মাসবাগানে জুনিবাপদাগিদু লুঙেগি। ইচ্যেও সে পয়দ্যানে জুনিবাপদাগিদু ভুজল্যা বাপে ইচ্ছে।

দুই

কয়েক মাস বিদি যেইয়ায় জুনি কেলাস ফোরর বার্ষিক পরীক্ষো দেনা থুম গরিল'। ভালোক দিন সঙ স্কুল ছুটি আঘে। জুনি ওইয়্যা ধোরি জনমান রাঙামাত্যে শহরত। আদাম কেয়ান্যান ন'দেঘে কন'দিন। জুনিরে আদাম দেঘা নেযায় পারা এ বন্ধবোত্ জুনি বাপর পরিবার মাছ্যেছরা বেড়া

যানা ঠিক গোরিলাক। আদামত বেড়া যেবার কধা শুনিনে জুনি পল্যেন্দি মু ভোদা গচ্যে। যেদ' ন'চায়। খাগরাছরিত লুম্মেগোইদে চোগ'পানি চেরাং চেরাং। পানছরিত্তুন যেক্কে চান্দের গারিত উধিলেক সেক্কে তেহ্ এক্কা আহ্ঝির-খুঝির অয়। আধঙ ন'আধঙ গোরিনে চান্দের গারিয়েনত গাদেই গাদেই বেক্কুনে সোমিলেক। হুম্মোক-হাম্মাক পদেন্দি তারা চান্দের গারিয়েন ফালেম্ন ফালেম্ন যার। এক এক্কু ফালম্নানাত গারিয়েন' চালত্ ধুস খেই তালেম্না পিরে অহ্ভার অক্ত অয়। চেরোকিত্যা যিন্দি রেনি চেদ' সা'দ বানা এ্যাহ্ল এ্যাহ্ল মুরো। সে মুরোউনোত কলা, আনাজ, ওলোদ, মোক্যা, কুছ্যেল আ নানান বাব'দর খেত চোগত পরে। বেলান যেক্কে ডুবং ডুবং সেক্কে তেহ্ তারা চান্দের গারিয়েনত্তুন পিরে কিয়্যালোই লামিলেক। এ পরেন্দি গাড়ি ন'যায় আর- বানা আহ্ধা পথ। আহ্ধি যাদে যাদে এক্কান ঝার লাঘত পেলাক। ঝার কর্ত্তাদি যেক্কে তারা বানা তিনজনে আহ্ধি যাদন সেক্কে ঘুতঘুত্যা আন্ধার। টিপবাত্তি জ্বালেনেই মুরো উদি মুরো লামি আহ্ধু সঙ এক্কান ছরা পার অলাক। প্যাকপেদি গোরি অহ্রান ওইয়ায় ঘরত লুমিলেক্কে টানা দ্বি-ঘন্টা আহ্ধানার পরেন্দি। চেরোকিত্যা ঘিরিয়ে গোরি বেরা দি ভাঙাচাঙা এক্কান গুদোম। সে বেরায়ানির হেমানি পুরোন ওইয়ায় জাগাত জাগাত ভাঙি যেনে লোঙি পজ্যে- গিরোচত্তুন নুও বেরা দিবের উহ্ব নেই। গাছপালা নেই এ্যারেয়ে এক্কান উধোন গায় গায় চিতপুরে পা গোরি পোরি আঘে। ঘর' দোরানত কাঙুরোকুজো গোরি দাবা খেই খেই এক্কু ল্যাম্প জ্বালেই ভুজল্যা বাপে জুনিদাগিরে বাছ্যেই আঘে।
ইধু ভারি পানি রাহ্দ। বেঘ' কায় যে টিউবওয়েল্লু আঘে সিয়োধ যাদেও চিগোন-চাগোন এক্কু মুরো লামা পরে। গাদিগোদাই সাংসাঙ্গ্যে ওইয়ায় জুনিদাগি ভাতপোইয়ত বোলাক। জুম্ম ধান' চোলর গরম গরম ভাত্তোই পহ্ন পহ্ন কুমড়ো ঝুল আ তাবাহ্ দি পুজোক শাক গোরবাউন'রে ভুজল্যা মা বারিহ্ দিল'। তোনানির ধক দেনেই জুনি পেটপুরানান' ধেই গেল। তাম্মা ডরে মোলি মোলি কয়েক গোরাস আহ্ভেধাবোত্ ভরেবার ব্যর্থ চেরেস্ত্মা গোরিল'। সে ভাতদলাউন ন' লামিনে গত্তনাত গ্যাদ দি যার! কন'ভাবদে কয়েক গোরাস খেইয়ায় জুনি ভাত পোইয়োত্তুন উধিল'।
পহ্রান্যেবোত্ ভারি দুগ পান মাছ্যেছরা আদাম্যেউন। আদামানত এজ' কারেন্ট ন' লুমেগি। তারা কপাল ভালা ইধু আগোন মাসত এচ্যন। এক্কা এক্কা জার পরের সেধক আর গরম নেইয়ায়। বেত পাদি বিচ্চেনেই মোজুরি টাঙেই তারা যেক্কে ঘুমোত পলম্নাক সেক্কে শিয়েল দগর'দন।

তিন

এ্যাহ্ল আগাচ্চান রাঙেইনে বেলান রেনি চেল'। বেন্যা ঘুমোত্তুন উধিনেই জুনি আঘাহ্সালত গেল'। যেইনে আঘাহ্সালানর ধক দেঘি ঘুয়ানও লাজে পুন'ভেদাবুত এ্যাহ্ন গোরি সমিলোগোই দে আর ন'লিগিলিল'! সে আঘাসালানর চালান এধক বাধি- হক্ গোরি সোমা পরে আ বানিবের কন' দোর নেই। বানা এক্কান বস্ত্মাফাদা পর্দা ধক্যেন গোরি দোরানত

বাযেই দি থইয়ন। দ্বি কিত্তেন্দি দ্বিবে ইদদলা আ মধ্যেন্দি এক্কান তোন ভাঙা। সুওধ ভেলে আঘাহ্না! অত্তে অত্তে আ এ্যাহ্ল মাছি ধাবেই ধাবেই আঘা পরে।
কপাল চিদেহ্ গোরি জুনি তা বাপ'রে কয়, "বা, আমি কমলে ঘরত যেবঙ? যেই না ইচ্যে যেয়োই।"
জুনির কধা শুনিনে তা বাপে আহ্ঝিনেই কল', "কেল্যা লুমিনেই এচ্যা যেদ' মাগত্তে! এঝ'ধ' আদামান গমে ন'দেঘচ। আর' দ্বিবে দিন থেইয়াই তে যেবঙ দে মা।"
"নাহ্, মুই সেদক দিন থেই ন'পারিম।" কানং কানং মু'গোরি জুনি তা বাপ'রে কল'।
"তুই থেই চা মা। গারে গায় তত্তুন গম লাগিব'। এক্কু দিন থেইয়ায় যুনি তত্তুন গম ন'লাগে মরে কোচ্। সেক্কে মুই আর না ন'গরিম। ঠিক আঘে?"
তা বাপ' মুও কিত্তে চেইনে তিগুত তিগুত গোরি জুনি কন'রকম মানি লল'।
আজের বিজের ওইয়াই জুনিদাগি ভুজল্যা বাপ' লঙে আদাম বেরা লামিলেক। আদামানত সেধক মানুজ ন' থান। এক এক্কু ভিদেত বানা এক্কান-দ্বিয়েন ঘর চোগত পড়ে। আদাম্যেউনর সেধক তেঙা-পয়সে নেই। তারা জুমত দুগ-কাম গোরি খেইয়্যা মানুজ। ভুজল্যা বাপে জুনিদাগিরে তারা ভুইয়ানি দেঘেলোগই। চেরোকিত্যা বানা এ্যাহ্ল ভুই আ ভুই- চোগে মোনি ন'পাচ্যে পা! ধানুন পাখ্কন্দি। এযেত্তে মাসত ধান কাবিবের অক্ত অভ।
বেড়াদে বেড়াদে এক্কান ঘর' উধোনত জুনি কালা রঙর এক্কু এহ্মান দেঘিল। লাম্বায় সিবে চের আহ্ত অভ, থুত মু, থেলেস্ন্য নাক আ গুরিং গোরি এক্কান লেজও আঘে! আহ্মক গোরি জুনি সিবে কিত্যা চেই থেল'। পেক্কোয় লেদের পেদের গোত্তে গোত্তে সে এহ্মান্নুও জুনি কিত্যা চেল'। জুনির চেই থানায়ান মনত ন'পরিনে মনে অয় গোঁত গোঁত র' গোরি সিয়োত্তুন ধেই গেলগোই।
জুনি তা বাপ' আত্থান ধোরি পুঝোর গলস্ন,
" বা, সিবে কি?"
"সিবে এক্কু মালাহ্ শুগোর।"
"তে কিত্যা প্যাক্কোই খারা খেলের বাবা?"
"তাত্তুন পেত পুরের ধ' সেত্তেই মা।"
"তে কি প্যাক খাইদে?"
"ই।"
"কিত্যায় তে প্যাক খাইদে বা?"
"তে প্যাক সুওদ পাইদে সেত্তেই মা।"

চের

পরের দিন্যে দিবিস্যে মাধান। জুনিবাপদাগির এক আদাম্যে বরকানাদাগিদু তারা বেক্কুনে বলান্যে খা গেলাক। বরকানাদাগিও জুনিদাগি ধক্যেন বরবো কোজা কুমড়োদাগি। তারা ঘরান দোল আঘে। বেরচাগা দিয়ে ঘর। উদোনানত ধাঙর এক্কু বকফুল গাছত তলে তিন চের বজস্যে

এক্কু গুর' সিগোন নাকগোরি রাঙা রঙর কারন্নস্যে এক্কু কুগুরলোই খারা খেলের। কুগুরবো তারারে দেঘি লেজ লারেই লারেই লেচ্ছর কারিল'। মোক-পুওলোই বরকানাদাগি জুনিদাগিরে ঝু ঝু জানেনে ঘর ভিদিরে নেযেলাক।
"এয এয, বজোগি। আমার কি বরকপাল ইচ্যে আমা ঘরত তুমি তেঙ হুচ দিলা!" বরকানা আহ্ঝি আহ্ঝি কোইনে পিরে বাভেই দিল'। "তেহ্ গম আঘ দে নইনে?"
"অধে অধে। তুমি কেঝান আঘ?" পুঝোর গলস্ন জুনিবাপে।
"আমিও ভগবানর আর্শীবাদে গম আঘি।" জুনিরে দেঘেই দি বরকানা পুঝোর গলস্ন, "এক্কু গোরি ঝি নাকি?"
"অধে।"
"ও। পুও নেই?"
"নাদে।"
"তমার কয়বো ঝি-পুও?" বরকানারে পুঝোর গলস্ন জুনিমা।
"আমার দ্বিবে ঝি আ দ্বিবে পুও।"
"উধোনত খারা খত্তে সিবে নাকি বেগ' চিগোন্নু?"
"অধে। আরক্কু পুও স্কুলত যিয়ে।"
"তেহ্ ঝিউন?"
"ঝিউন দুওবো বৌ দিয়্যেই।"
"বাহ্, গম ওইয়্যা। জাগুলুক সিরেই ফেলেয়চ্ সালেন।" আহ্ঝিনে জুনিমা কল। কি এক্কান মনত উধিনে জুনি মা ব্যাগত্তুন এক্কু মজা নিঘিলেই বরকানারে বাভেই দিল'। "চিজিবোরে এক্কাউক্ক খেবার জিনিস আনি দিয়েই। ইয়ানি থগোই।"
"আহ্, সিয়েনি কিত্তেই আনি দিওদে! লাজ গোরে পা।"
"কিচ্ছু ন'অভ'। ত' পুওবোরে দেঘোই।"
বরকানা মোক্কু এক্কু কুত্তিলোই শিংগবাত সমিনেই কল', "হাক্কন বজ। মুই ভাত বারি দোঙ।"
"অধে অধে। বেজ কিজেকিজ্যা গোরিবার দরকার নেই।" জুনিবাপে কল'।
বরকানালোই তা মোক্কু গুধিভিদিরে সমিলে জুনিদাগি তারা শিংগবায়ান এক্কা গমেদালে রেনি চেলাক। শিংগবানর জিনিচ্চানি চেবার চেবার। অহ্রিণ' শিরে, অহ্রিণ' চাম, ঘিলেত্থাক, বান্দর' সাঙু.... কি নেই!
বরকানাদাগি তারা ঘর' রাধাকুরবো কাবিনে ভাত রানি দিওন। ভালক পধ তোন- কুর' এহ্রা, বরনা শাক্কোই পাঘানা বেগুন, আঘাঝা ফুল গুদেয়্যে, সিদোল দি মরিচ বাত্যেলোই সিনেয়্যে শাক। গিরোচ্চু তারারে খুব গোরি লোবিয়ত গোরিল'। জুনিবাপ'রে কুর' থেঙ, জুনি মা'রে কুর' রানান আ জুনিরে চিদঘিলেয়ানি বেই বেই পোইয়ত তুলি দিল'।
"এধক পধ তোন কিত্যেই রান্যধে?" জুনি মা কল'।
"আ কুধু তোন! চুধ'-মুধ' খো আই। লারে লারে খেয়ো। মুই দে গোরবা লোবিয়ত গোরি ন'জানঙ্গ্যে।" বরকানা কল'।

"ওইয়্যা ওইয়্যা, আমি লোই লোই খেবঙ। তেহ্ তুমি হক্কে বোভা? তুমিও বজোগি না।" জুনিবাপে কল'।
"আমি খেবঙ আই। ইক্কু তুমি খ' ।" বরকানা মোক্কু কল'।
জুনিলোই তাম্মার গমে ভাত খানা ন'অলেও জুনিবাপে ইহ্ল গোরি ভাত খেল'। ভাত খেই ফুরেনে মিষ্টান্ন আনি দিলেক। মিষ্টান্নয়ান সুওধ অহ্ভ' পারা পেনেই জুনি এক্কা লোই চেইয়্যা। খেই চায়দে দুধ আ চিনি এধক কম মনে অল'দে বানা পানিয়ান্দই বিনি ভাত্তোন ঘাত্তন!
ভাত খেইয়াই এত্তে এত্তে পেত্তু পুস্যেই পুস্যেই জুনি বাপে কল', " আহ্। পেদা তিঙ তিঙ ওইয়্যা। ইচ্যে ভাতসাচ্যে ভারি ইহ্ল অল'। ভালক দিন পর এয়ান্যান গোরি রান্যে তোন খেই পেলুঙ।"
জুনি বাপ' কধা শুনিনেই জুনিলোই তাম্মা মু চা-চি গোরিলেক।
"খেইয়াই বন্নাম গরে পা। কুর' এহ্রান ধ' গমেও ন' সিঝে। তেল মসলস্নাও এক্কেরে কম। তর কেনে গম লাগিল? মুই ধ' বলে খেয়ঙ।" জুনি মা কল'।
"আদামত এয়ান্যান গোরি রানন্দে। খাস্ চাঙমা তোন ইয়ানিরে কয়দে। তুমি ধ' বাঙাল' ধক্যেন তেলস্নই এহ্রা ন' রানিনেই এহ্রালোই তেল রান'দে।"
"অয় অয় এবারত সালেন কুর'এহ্রা বানা পানিলোই সিজেই রানি দিম্মে। গমেদালে খেচ্ তেহ্। তেল মসলাও ন'লাগিব'। মরও আর দুগ গোরা ন'পরিব'। খরচও ন'অভ।"
"আহ্, আকি রাগ জ্বলস? আদামত কিত্যে এচ্চস্যে? আদামত রান্যে তোন এক্কা চাগি ন'চেলে কুত্তুন অভ'!"

পাঁচ

মোন সেরেন্দি রাঙা চিক চিক গোরি বেলান ডুবেলেস্নাই। পেক্কুনও যা বাহ্ত তেহ্ ফির'দন। আমগাচ্ছ্য তলে জুনি নিমোন গোরি গায় গায় খারা খেলের।
"জুনি, ও জুনি, ঘর' ভিদিরে আয়। সাঝন্যে ওইয়্যা।" ভুজল্যা বাপদাগির গুদোম ঘরানত্তুন জুনিমা ডাগিনে কল'।
"ই... মা, এযঙর।"তাম্মা র'বো শুনিনেই মনে ন'হোইয়ে গোরি জুনি সমোত দিল'। কবালত আহত্থান আনিনে ডুবন্দি বেলান রেনি চেল'। মোনমুরোউন রিপ রিপ গোরি কালস্যে গোরি দেঘা যার। বেঙাহঙা পত্তানন্দি জুনি গীদ গেই গেই ফালেস্ন ফালেস্ন ঘরত ফিরের। সেচ্ছানা শাক' গাচ্ছ্য উজু এনেই জুনি থেঙান চিগুত গোরি উদিল'। পহ্র পহ্র আন্দার'মায় লিলিক লিলিক গোরি এক্কু সাপ যাদে দেঘিল' জুনি। সাপ দেঘি ডরে এক্কু কিজেক দিবের সময় ন'পেল'। সিওধ মুয্য যেনেই জুনি ধুলি পরিল'।
জুনিরে ডাগিবের ভালক্কন পরেন্দিও ঘরত ন' ফিরিনেই জুনি মা'র চিদে ধরিল'। ল্যাম্প এক্কু লোনেই জুনি মালোই ভুজল্যা বাপে জুনিরে তোগা ধরিলেক। ডাগদে ডাগদে সেচ্ছানা গাচ্ছ্য উজু জুনিরে উভোতপুন্দরি গোরি লাঘত পেলাক। জুনিরে সেয়ান্যান গোরি পোরি থাগদে দেঘিনেই জুনি মা বুক্ক চিগুত গোরি উধিল'। ধাবাহ্ ধাবাহ্ কায় যেনেই দেঘিলাক্কোই জুনি

থেঙানত কিয়্যে জানি দ্বিবে দাঁত ফুদেই দি যেইয়্যা। থেঙান গমেদালে চিবি চেনেই ভুজল্যাবাপে কপাল চিধে গোরি কল', "অবস্থা ধ' গম নয়। তভা সাপ অভ'দে। ঝাদিমাদি দারস্ন ন'দিলে জুনির বিপদ অহ্ভ'।"
"কি, বিষবলা সাপ! কি কলেদে ভুজল্যা বাপ.... ম' জুনির বিপদ অভ'দে? ও ভগবান বুদ্ধ, ইক্কু কি অভ'?" জুনি মা কিজেক সারি উধিল'।
"চিদে ন'গোরিচ। ব্যবস্থা অভ' আয়। আক্কে জুনিরে ঘর' ভিদিরে নেযেয়।"
দ্বিজনে ধোরাধজ্যে গোরি জুনিরে ঘর' ভিদিরে নেযেলাক।
কলি মা ভুজল্যা বাপ'রে পুঝোর গলস্ন, "ইন্দি কায়কুরে কন' ডাক্তর নেই?"
"হাসপাতাল এক্কান আঘে। হালিক সিয়েন দূরত। যাদে যাদে বেন্যা পহ্র অভ'। সেদক্কন সঙ জুনিরে সেবাদে থোই ন'পারিবং।" ভুজল্যা বাপে দারিয়ানি হাছ্যে হাছ্যে কল'।
"তেহ' আমা জুনির কি অভ'?" চোগ পুঝি পুঝি জুনিমা কল'।
জুনি চোক্কুন গমে পরীড়্যো গোরিনেই ভুজল্যা বাপে কল', " মুই এক্কা-উক্ক বৈদ্যদারস্ন খবর পাঙ। এক্কু গাজ দারস্ন লাগে। সে গাছ্য পাদায়ানি বাদিনেই রস নিঘিলেই বারো ঘন্টার মধ্যে রস্নক্যেবোরে খাবেই পারিলে পরানান বাজি যেব'।"
"সালেন সে গাজ' পাদায়ানি খাবেবার ব্যবস্থা গর ভুজল্যা বাপ।"
"হালিক এক্কান সমস্যা আঘে।"
"কি সমস্যা?"
"সে গাছ্য তোগাদে এক্কা সময় লাগিব'। মুজুঙে যে দাঙর মুরোবু দেঘর, সে মুরোবত গাছ্য আঘে। ঠিক কন্ জাগায়ানত গাছ্য আঘে সিয়েন মত্তুন গমে ইধত নেই।"
"তেহ্ কি অভ'? ম' জুনিরে কেনে বাজেবং?"
"চিদে ন'গোরিচ। মুই তরে কধা দিলুং অক্ত সিঝ যেবার আক্কেই সে গাছ্যত্তুন পাদা আনিনেই জুনিরে খাবেবার ব্যবস্থা গোরিম।"
"আমি ত' সিধু গোদা জনমান ঋণী থেবঙ ভুজল্যা বাপ।"
জুনির সাপ কামর খেইয়্যা ঘা'য়ান উগুরে এক্কান কাপরফাদা ভিরি ভিরি বানি দিনেই জুনি মাত্তুন বিদেয় লল' ভুজল্যা বাপে। হাক্কন পর জুনি বাপে ঘরত লুমিনেই জুনিরে পোরি থাগ'দে দেঘি কি ওইয়্যা পুঝোর গোরিল'। জুনিমা কানি কানি তা নেক্কোরে বেক্কানি কল'। জুনি মা'র কধায়ানি শুনিনেই জুনি বাপ'রও চিদে ফুদিল'। দশচো নয়, পাচ্য নয় এক্কু গোরি ঝি তারার। তারে বাজেবাত্যেই ভিলি ইচ্যে তারা কিচ্যু গোরি ন'পার'দন। ইক্কে ভগবান' নাঙ গোরিনেই ভুজল্যা বাপ' আঝায় বাচ্ছে থানা সারা তারার কন' উবোয় নেই। এহ্ন অক্তত উরউরেই ঝর আনিল'। এ ঝড়মায় ভুজল্যা বাপে কিঙিরি মুরো উধেলেস্নাই সিয়েন চিদে গোরিনেই জুনি বাপ-মা'র মুও চুধ' অহ্ল'। ঝরান দ্বি-ঘন্টা দিনেই তেহ্ থামেল'। ইন্দি ভাত-পানি নেই চোগত ঘুম নেই গোরি জুনি বাপ-মা'উন ভুজল্যা বাপ'ত্তেই ঘর' উধোনত বাচ্ছেই আঘন। রেদো সম্ভাগত ভুজল্যাবাপে প্যাক-পিদি গোরি লুমিলোগি। ভুজল্যা বাপ'রে দেঘি জুনি বাপ্লোই জুনি মা'র চোগত খুঝির পহ্র ফুধি উধিল'।

জুনি মা হ'নিজিস্যে গোরি পুঝোর গলস্ন, "পিয়োচ্ছি? দারন্নয়ানি পিয়োচ্ছে?"
" পেয়ঙ। কন' চিদে ন'গচ্চ্য আর।" আহ্ঝি আহ্ঝি ভুজল্যা বাপে কল'।
বনিজেস ফেলেই নেচিদে অহ্লাক জুনি মা লোই জুনি বাপে। দারন্ন পাদায়ানি বাদিনেই রস্সান জুনিরে খাবানা অল'। দারন্নয়ান খাবেবার ভালক্কন পরেন্দি জুনির কিয়্যে আ চোগ' রঙানি স্বাভাবিক ওই উধিল'। বেন্যা পহ্র অহ্ভার কাদাল্যে জুনির উহ্ ফিরি এল'। সেদিন্যে ভুজল্যা বাপ-মা দাগিত্তুন জুনিদাগি বিদেয় লোইয়াই রাঙামাত্যেত ফিরি গেলাক্কোই।

ছয়

এক বঝর পরেন্দি। ইচ্যে জুনি তা বাপ' লঙে হাসপাতালত যার। ভুজল্যা বাপে ভঝমান অসুখ। ইহ্ধ ক্যানসার ধরা পজ্যে। চিকিৎসে গোরিবাত্যেই লাগিবেক ভালক্কুন তেঙা। ইত্তো-কুদুম তারা ইধু বেরা এনেই তারে যে তেঙাউন হিরবে গোরি দি যেয়ন সে তেঙাউন এধকদিন তেহ্ ইক্কু মাদি ব্যাংকত জমেই রাঘেইয়ে। পয়সে আ কাগজো তেঙা মিলি ব্যাংক'বো ভত্তি ওনেই ঘোহ্র ওইয়্যা। সে থুবেয়্যে তেঙাউন ইচ্যা তেহ্ ভুজল্যাবাপ'রে গোঝেই দিবগোই। মাত্যে ব্যাংক্কু বুগোত আজাবোদে ধোরিনে জুনি তা বাপ' আহ্ধ ধোরি যার। হাসপাতালত লুমিনেই ভুজল্যাবাপ'রে যে গুদিবোত থোইয়ন সিয়োত তারা দ্বি-বাপঝি গেলাক। ভুজল্যা বাপে ভজমান হেঙেদা ওইয়্যা। কধা কধে কষ্ট অয়। হাসপাতাল' খাত্তানত এহ্লান দি ভুজল্যা বাপে বোই আঘে। তা ধাগেন্দি ভুজল্যা মা চুধো মু গোরি বোই আঘে। জুনিদাগিরে দেঘিনেই ভুজল্যা বাপে এক্কা আঝং আঝং গোরিল'।
ভুজল্যা মা থিয়েনে পুঝোর গলস্ন, "জুনি বাপ, তেঙার যুগোল গোরি পাচ্য?"
"ভালক্কানি জাগাত সাহায্য মাগা ওইয়্যা। মানজেও তেঙা পাদাদন। তেঙার যুগোল ওই যেব' পারাপাং। চিদে ন' গোচ্য।" জুনি বাপে কল'। "তেহ্ ভুজল্যা বাপ, ইক্কে কি অবস্থা? এক্কা পাদল পহ্র না ন'পহ্র?"
ভুজল্যা বাপে এক্কান আহ্ধ তুলিনেই ইজেরেদি বুঝেল' তে গম আঘে।
" ত' লঙে ইচ্যে জুনি দেঘা গোরিবাত্যেই ইচ্চে। জুনি ভিলি তলেস্নাই কয়েককানি কধা কহ্ভ'।"
"কুধু গেলে মামা? আ কি লাজর? যা, ত' জিদু ইদু যা।"
তা বাপ' পিচ্ছেত্তুন জুনি লাজাং লাজাং গোরি মুয়ান বাভেল'। তা বাপ' ইন্দি এক পল্যা রেনি চেনেই এক হুচ দ্বি-হুচ গোরি লারে লারে ভুজল্যা বাপ' ইদু গেল'। ভুজল্যা বাপে আহ্ঝি আহ্ঝি বিচ্ছোনোত বোবাত্যেয় ইজেরা দিল'। শিরেবো ডেনে-বাঙে বিজিনে জুনি ন'বভো বুঝেল'। তা ব্যাংক ছ'বো দ্বি-আহ্ধতোই ধোরি ভুজল্যা বাপ'রে বাভেই দি কল', "জিদু, ইগুন ম' জমিয়ে তেঙা দে। এ তেঙাউন্দই চিকিৎসে গোরিনে ঝাদিমাদি গম অ। মুই আদামত আর' বেরা যেবার চাঙ। মরে তুই আর' লোই বেরেস দে।"
ভুজল্যা বাপে জুনি ইন্দি হানক্কন রেনি চেই থেল'। আহ্ঝিনেই ব্যাংক ছ'বো লোনেই জুনিরে আজাহ্ গোরিল'। ভুজল্যা বাপ' চোক্কুন ভারি পোরাদন। চোগত পানি এযের। তা

চোগপানিয়েন তে কারোরে দেঘেবার ন'চায়। কি লাজ গোরে পা এস্মা বুরো মান্জেও বুজো' কানে!

.....
ভিএন চাঙমা, বিশিষ্ট গল্পকার, রাঙ্গামাটি।

লাভলী বাশার

বাকরূদ্ধ

বিছানা ছেড়ে উঠল, আমন। রাতে ঘুম হয়নি। ঘুমদূত আমনের চোখে মরফিন দিতে পারেনি। তার কারণ প্রতিরাতে একলাইন হলেও লিখতে হয়। কিন্তু একটা রাত ব্যর্থ হয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। যে রাতে তার কলম আঁচড় কাটতে পারেনি। বিরক্তিকর নিজে নিজেই একথা বলে ঘর থেকে বের হতেই থমকে দাঁড়াল। ভালভাবে তাকিয়ে দেখে না, তার ভুল হচ্ছে না। যা দেখছে তা সত্যি। এ নির্জন দ্বীপে একমাত্র মানব সে-ই। চারিদিকে ধূ-ধূ পানির চাদর। দূরে মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে পৃথক করা হয়েছে। স্থল বলতে এ বাঁধের মাটি। এ মাটির ওপর সারি সারি সবুজ নারকেল গাছ । গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবজির ক্ষেত। এটা আমনের তৈরী। এতে দুটো কাজ হয়েছে। একদিকে নাঙ্গা দ্বীপের মাঝে কিছুটা সবুজের আল্পনা। অন্যদিকে আমনের নিত্যদিনের খাবারের চাহিদা পুরণ হচ্ছে।
কিন্তু এ মানবীর আগমন কোথা থেকে ! আমনকে ভাবিয়ে তুললেও অবাক করেনি। পৃথিবীতে অনেক ঘটনাই ঘটে। স্রষ্টার কাজ নতুন কিছুর মাধ্যমে পৃথিবীকে বৈচিত্রমন্ডিত করে তোলা। এমনই কোন এক স্নিগ্ধ শরতের ভোরে জনমানবহীন এ নির্জন দ্বীপে আমনের আগমন ঘটেছিল। সেটা ছিল সত্তর দশকের ঘটনা। তখন এ উত্তাল মাতামুহুরী ছিল দুর্দান্ত স্রোতস্বিনী। তার মূর্তি ছিল ভয়ংকর। ওই দূরে নদীর ওপারে উপকূল ছিল আরো বিশ মাইল ব্যবধান। আজ উপকূলীর গ্রামের গাছগুলো এখান থেকে একেবারেই ঝাপসা । মনে হয় ওখানে কোন গ্রাম আছে।
সেই মহাসমুদ্রের মতো নদীতে বাবার সাথে মাছ ধরতে এসেছিল আমন। উপকুলবর্তী গাঁয়ের মানুষগুলোর জন্য মাতামুহুরী ছিল এক দিকে যেমন আর্শীবাদ তেমনি অভিশাপ। তাদের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস এ নদী। আবার কখনো কখনো ভয়ঙ্কর নদী তার প্রলয়ঙ্করী তান্ডবে মুহুর্তে সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। উপকূলীয় মানুষগুলো মাতামুহুরীর এই খামখেয়ালীপনার সাথে অভ্যস্ত। মাঝে মাঝেই কোন না কোন বাড়ীতে কান্নার রোল। সে বাড়ির জেলে মাছ

ধরতে গিয়ে ফিরে আসেনি। জেলে বধূ নিরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলে পথ চেয়ে কালক্ষেপণ করে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে গৃহবধূর নিশ্বাস চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

উপকূলীয় কোন এক নিভৃত গাঁয়ে আমনের জন্ম। শিশু বয়স থেকেই ছেলে বাচ্চাদের মাছ শিকারের কলাকৌশলগুলো ধীরে ধীরে রপ্ত করতে হয়। অনেকবার মাঝনদীতে মৎস্য শিকারে বাবার সাথে এসেছে আমন। সেদিন ছিল বর্ষার শেষ দিন। আকাশে মেটে জোসনা। প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে আমনের জালে। তখন দশম বছরের বালক হলেও আমন মাছ শিকারে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল। নৌকাভর্তি মাছ দেখে পিতা-পুত্র ভীষণ খুশি। কিন্তু প্রলয়ংকরী মাতামুহুরী ওদের খুশির উপর মুহূর্তে অভিশাপের ছামিয়ানা টেনে দিল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আমন নিজেকে আবিষ্কার করল এই দ্বীপের এ জায়গাটিতেই। যেখানে আগন্তুক নারীটি পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মানবের নিষ্পাপ মুখের দিকে আমনের চোখ তাকিয়ে আছে পলকহীন। শ্যামা বরণ । চোখ দুটো ঘুমে ডোবা । বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে চোখের ডাগর গড়ন। স্নিগ্ধ দুটো ঠোঁট। কালো তিল ঠোঁটের নীচে স্পষ্ট। আরো মোহময় করে তুলেছে।

ঘরের কোণে নারকেল গাছটিতে বেশ কিছু পাখির আবাস। আমনের প্রতিবেশী ওরা। আজ আশ্বিনের প্রথম ভোর ! দোয়েলগুলো জুটি বেঁধে খুনসুটি খেলছে। ওদের কিঁচির-মিচির শব্দতরঙ্গ আমনের সৌন্দর্য দর্শনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। আমনের ভেতরে তখন মায়াবী টান। মেয়েটিকে ধরে পাজাঁকোলা করে ঘরের ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন। হয়তো কোন পাষন্ড মেয়েটিকে অত্যাচার করেছে। ক্লান্ত নিথর শরীর ! পাতলা চাঁদর জড়িয়ে দিল ওর গায়ের। মনে মনে বলল, ঘুমোও মেয়ে। স্বস্তি মেয়েটির ঘুমন্ত শান্ত মুখ দেখে। ভেতরে ভাললাগার স্নিগ্ধ অনুভুতি। মনটা প্রশান্তিতে ভরা।

প্রকৃতিতে ভোরের আনাগোনা, তবে এখনো আলো ফোটেনি। আলোআধাঁরিতে ছওয়া পাখির কিঁচির-মিচির। আকাশের অন্ধকার বিলুপ্ত হচ্ছে ধীরগতিতে। আমন নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সবজি বাগানে গিয়ে রান্নার জন্য লাকড়ি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।অন্যদিন লতা-পাতা দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে নেয় আমন। কিন্তু আজ তার ঘরে অতিথি ! সে হয়তো এসব খায় না। কিছু সবজি ও লাকড়ি নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে।

সূর্য উঠে গেছে। প্রথম আশ্বিনের ঝলমলে রোদচারিদিকে। প্রকৃতি যেন উৎফুলস্ন । ঠিক যেমনটি আনন্দ আজ আমনের মনে।

মেয়েটি ঘুম থেকে জেগেছে। শান্ত স্বাভাবিক চেহারা! হাতমুখ ধূয়েছে। ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখল বার কয়েক। ঘর বলতে কাঁদা মাটির ওপর বেশ উঁচূ করে মাচানের উপর ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। ঘরের ভেতর আসবাব বলতে একপাশে বিছানা পাতা। বিছানার ওপর তেলচিটচিটে একটা বালিশ আর কম্বল। রান্নার জন্য দুটো হাঁড়ি আর কয়েকটা ঘটি-বাটি। এক পাশে মাটি দিয়ে খানিকটা জায়গা বিঘৎখানেক উঁচু। এ মাটির ওপর তিনপাশে তিনটি মাটির ঝিক বসিয়ে তৈরী করা হয়েছে উনুন।

আমন ঘরে প্রবেশ করে আরো বেশি খুশি তার ঘরে যেন কোন শিল্পীর ছোঁয়া পড়েছে । সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। মেয়েটি সবকিছু পরিষ্কার করে রেখেছে। ঘরের দক্ষিণ পাশে ছোট জানালা। জালানা দিয়ে পানির দ্বীপ দেখছে মেয়েটি।

বাহ্ ! চমৎকার ! আমনের কথায় মেয়েটির চোখ দুটো জানালা থেকে সরানোর পরপরই বক্রভাবে পড়ল যেন আমনের দিকে।

আমন জিজ্ঞেস করল, তুমি কে ? কীভাবে এখানে এলে ?

মেয়েটি নিরত্তর। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমনের দিকে।

আমন ভাবল, হয়তো বলতে চাচ্ছে না তার জীবনের কথা। ওর চাউনি বলে দিচ্ছে, কিছু বলতে চায় না , কিছু মনেও রাখতে চায় না। আমন ফের বলল, আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানতে চাই না। কিন্তু বল, কোন নামে ডাকব তোমাকে ?

এবারও নিরত্তর।

আবারও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, বল না গো অচেনা মানব, কী নাম দেব ?

তবুও নিরম্নত্তর মেয়েটি। শুধু চোখ দুটো অসীম গহীন। কালো দুটো চোখের গভীর চাহনি কি বলতে চাইছে, মনে মনে প্রশ্ন করল আমন।

বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। নির্জন দ্বীপের মাঝে নির্বাক দুটো মানব মানবী। পাখির কিঁচির মিচিরে যেমন এ দ্বীপের নিরবতায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায় তেমনি আমন এ মুহূর্তের নিরবতা ভেঙে দিয়ে বলল, কিছু একটা বল ! তোমার যা ইচ্ছে করে, যেমন ইচ্ছে

না, মেয়েটির কোন পরিবর্তন নেই।

আমনের মনে তখন প্রশ্ন, তাহলে মেয়েটি বোবা ! উত্তরটাও নিজেই দিয়ে ।দিল, হয়তো তাই। এই মেয়ে শোন ! প্রত্যেক মানুষকে ডাকার জন্য একটা নাম থাকে। আমি তোমাকে একটা নাম দিলাম, 'আশ্বিন'।

যেহেতু আজ আশ্বিনের প্রথম দিন ! এই নির্জন দ্বীপে দ্বিতীয় মানবের পদার্পণ, নিজের মনে যুক্তিটা দাঁড় করাল আমন ।

আশ্বিন ততোক্ষানে উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে। সবজি কেটে নিজে নিজেই রান্না শুরম্ন করেছে। আমন দেখছে, একজন শিশুর কাছে যেমন পৃথিবীর সবকিছু নতুন লাগে। তেমনি বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মনে।আশ্বিন এই দ্বীপের যেন নতুন কোন শিশু।

নির্জন জলরাশির সঙ্গে আমনের বসবাস দীর্ঘদিন। মনের অব্যক্ত কথাগুলো কলমের ছোঁয়ায় কাগজের পাতায় এঁকে রাখে। আর ওই দূর আসমানের অসীম শূন্যতায় উড়িয়ে দেয় মনের বাকি আলাপন। লাবন্যময় বৈকালী বৈঠকে খুনসুটি করে উড়ন্ত ধবল বকের সঙ্গে। নারকেল গাছের বাসিন্দা পাখিদের সাথে খেলা করে কাটিয়ে দিয়েছে অনেকগুলি বছর। আজ তার পাশেই আশ্বিন। অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা। কেন যেন বার বার তার ইচ্ছেকে নাড়া দিচ্ছে কেউ রহস্যের জট উন্মোচন করতে। আমন মনকে সংযত রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে। কিছুতেই বারণ মানতে চাইছে না মন। যতই চেষ্টা করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, ততই মনটা বেঁয়াড়া হয়ে ওঠে আশ্বিনকে জানার জন্য। কিন্তু কিভাবে জানবে ! আশ্বিন যে বোবা ! সে কারণেই কী

আমনের জানার আগ্রহ প্রবল! হাওয়া যেমন নিষিদ্ধ গন্দুমের আকর্ষণে নিজেকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, আমনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে।

পড়ন্ত বিকেল ! প্রকৃতির সর্বত্র স্নিগ্ধ সুন্দর! পানির স্তর কমে এসেছে। তাই তো বকের দল লম্বা ঠোঁট মেলে দিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত। অল্প পানিতে মাছদের লাফালাফিটা বেশী লক্ষ্য করা যায়, ঘাটে বাঁধা নৌকায় বসে আছে আমন। তার সকল সংগীরা সঙ্গে আছে। শুধু আশ্বিনের উপস্থিতির অভাব বোধ করছে সে। আশ্বিন ! আশ্বিন ! বাইওে এস।

আশ্বিন বাধ্য মেয়ের মতো আমনের পাশে এসে বসল। কোন জড়তা নেই। দীর্ঘদিনের পরিচিত যেন ওরা। অথচ আজ ভোরের অতিথি আশ্বিন। পানিতে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ উৎফুল। আলতা পড়া রঙিন পা দুটো পানিতে যেন রঙিন মাছ, ছোট ছোট ঢেউ তুলছে জলে। আমন প্রশ্ন করল, আশ্বিন, তোমার ভালো লাগছে ?

প্রশ্নটা শুনতে পেরেছে কি- না তা বুঝবার উপায় নেই। আশ্বিন আপনমনে যা করছিল তা নিয়েই ব্যস্ত।

আমন হাত দিয়ে আশ্বিনের হাতটা ধরতে গিয়েও থেমে গেল। হাত ধরাটা হয়তো আশ্বিন পছন্দ নাও করতে পারে। আমন চোখ দুটো সরাসরি শান্ত আসমানের যৌবনতটে নিক্ষেপ করল। আকাশের নীলে শরতের সদ্য ফোটা ফুলটি এখন নড়াত্রের মতো। নাকি আশ্বিনের হাস্যোজ্জল মুখের প্রতিচ্ছবি। দেখতে দেখতে বিদায় ঘন্টা বেজে ওঠে সূর্যের। সন্ধ্যা দেবীর আয়োজনে আবছা শামিয়ানা, এক সময় ঢেকে দিল সমস্ত প্রকৃতি। আশ্বিন ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি মুহূর্তে জ্বলে উঠল তারকারাশির মতো।

আমন হাতমুখ ধুয়ে ঘরের কোণে ছোট্ট পাটির উপর বসল প্রার্থনায় । কোন ধর্মই আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেনি সে, ধর্ম বলতে বুঝে ভিতরের জ্ঞান, মুল্যবোধ আর নৈতিকতা। সে কারণেই সে প্রার্থনা করে সুন্দর প্রকৃতি যেন সব সময়ের জন্য অক্ষত থাকে। কিন্তু আজ তার প্রার্থনায় যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা । আশ্বিনের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনার সমাপ্তি টানল আমন। পেছন ফিরতেই চোখে পড়ল, আশ্বিনও দুহাত তুলে প্রার্থনা করছে। আমন ঠোঁট চেপে হাসল।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ভাবল তার সকল সঙ্গী নির্বাক ! শুধু হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে সব কিছু বুঝে নিতে হয়। আশ্বিন; বাদ যায়নি ! তাই তো স্রষ্টা বোবা আশ্বিনকে তার কাছে পাঠিয়েছে। যাতে নিয়মের কোন হেরফের না হয়। নির্জন দ্বীপের নির্জনতাকে রক্ষা করার জন্য বুঝি এমনটা করা হয়েছে। আমনের অস্থির মনটা শান্ত হয়ে আসে।

আমন খাতা কলম নিয়ে লিখতে বসল। আশ্বিনকে বলল, তুমি বিছানায় শুয়ে পড়। আমি নিচে ঘুমোব।

আশ্বিন যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে রইল। আমন লিখতে বসেছে। কলমের নীপে শুধু আশ্বিনের মুখ। কলমে শুধু আশ্বিনের মুখ। খাতার মধ্যে কলমের ওলটপালট আঁচড়। সেখানে নতুন প্রাতিচ্ছবি। তবে কি আমনের মস্তিস্কে অনুর্বর হয়ে পড়ল ! বিরক্ত হয়ে বাইরে এসে

দাঁড়াল।টানা পায়চারি । বিড়িাপ্ত মন। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল। আশ্বিন শুয়ে পড়েছে। আমন আর কালক্ষোপন না করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কতগুলো দিন পার হয়ে গেল এই দুই মানবের। আজ বিদায় নিচ্ছে শীত। শীত রাণীর বিদায় হলেও কাঁপন এখনো আছে। ভোর দূতের বার্তা আমনের চোখে পড়তেই ঘুমদূত পালিয়ে যায় আর সে চোখ মেলে তাকায়। তার গায়ে শীতল দুটো হাত। পাশ ফিরে হতবাক ! আশ্বিন ! এখানে এভাবে ! জড়িয়ে রেখেছে তাকে। হাত দুটো আলতো করে নামিয়ে দিল। ঘুমন্ত আশ্বিনের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে।

আমনের নীল যৌবনতট অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এ অজ্ঞাত জগত সম্পর্কে আমন কিছুই জানে না । হয়তো সেকারণে আশ্বিনের উত্তাল ঢেউয়ের শব্দ সে শুনতে পায়নি।

বাকহীন নারী মুখে কিছু বলতে না পারলেও তার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের হাহাকার, শুনতে পেল কি সে ? কিন্তু নির্বোধ পুরুষও বাকরুদ্ধ ! আশ্বিনের দগ্ধ মনটা এখনো ভাঙতে পারেনি, আমনের রুদ্ধদ্বার। কতগুলো রাত পার করছে আগুনের যন্ত্রণায়। ফুটন্ত ফুলের উত্তপ্ত দংশনে দগ্ধ হয়েছে প্রতিটি রাত !

দিনের অগমনে ফুটন্ত ফুলের পাঁপড়িগুলো স্বাভাবিক নিয়মে দল মেলে। আশ্বিন কাজ কর্মে ব্যস্ত। নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে আমন। আজ হাটবার। সপ্তাহের এদিনে কিছু মাছ বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে সে । মাতামুহুরী পার হয়ে বহুদূরে বটতলায় হাট বসে। ঘাটে নৌকা বেঁধে হাঁটে যায় আমন। ঘুরে ঘুরে বেচা-কেনা শেষ করে একপাশে গানের আসরে গিয়ে বসল। গানের আসর না বলে জনসংযোগ বলা যায়। লোকজন ঘিরে ধরেছে। কিছুক্ষণ শোনার পর আর ভালো লাগল না। মনটা উদাসীন। এর কারণ সম্পর্কে সে অজ্ঞ। কি যেন তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নৌকা ছেড়ে দিল।

যখন ঘরে ফিরেছে তখন গভীর রাত ! আজ প্রথম বসন্ত। ঘরের দরজা খোলা। আশ্বিন বিছানায় ঘুমে। বুকের বসন সরে গেছে। জানালার ফাক দিয়ে জোৎস্নার আলো পড়েছে সদ্য প্রস্ফুটিত দুটো ফুলে। আমনের বুকের ভেতরে হাসফাঁস দম বন্ধ হয়ে আসছে। আশ্বন কি জেগে আছে না বোঝার ভান করে পড়ে আছে কে জানে। আমন ধীরে কাছে অগ্রসর হচ্ছে। একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে কাপড়টা টেনে বুকের উপর ছড়িয়ে দিতেই আশ্বিন খপ করে ধরে হাত দুটো । নিজের গালের সাথে ছোঁয়ায় হাত।

আমন হাতটা ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। নির্জন দ্বীপের নিরবতা ভেদ করা কণ্ঠে যেন আর্তনাদ- আমি আর পারছি না আমন। আর কষ্ট দিও না।

আমন দুবাহু বেষ্টন করে আশ্বিনকে অলিঙ্গনে জড়িয়ে বলল, আশ্বিন! আশ্বিন ! তুমি কথা বলছ ? বল, বল, আরো বল। বুকের ভেতরে জেগে উঠেছে কামনার দানব। বত্রিশ বছরের শেষ প্রান্তের বসন্ত পথ দেখিয়ে দিচ্ছে নতুন পৃথিবীর। কোথাও যেন বিদ্যৎ চেরা জিব লকলকিয়ে উঠছে। আশ্বিনের নগ্ন বুকের মাঝে আমনের শুষ্ক দুটো ঠোঁট। আশ্বিন তাকে ঠাঁই দিচ্ছে নগ্নতার ভাঁজে ভাঁজে। আশ্বিনের বুকের গহীনে উচ্ছল জলের মধ্যে স্নানে নিমগ্ন আমন। দুটো ফুলের রেনু মাখা বৃন্তের ঠোঁটদুটো রাঙিয়ে নেয়। রক্তিম ঠোঁটের উষ্ণতায় ঘুমন্ত যৌবনের

সিঁড়িগুলো ভেঙে যাচ্ছে। এক এক করে পৌছে যাচ্ছে আগুন নেভানোর পর্বে। আমন এখন পরিপূর্ণ কৃষক। উর্বর বীজ রোপনের তাড়না পেয়ে বসেছে তাকে। হঠাৎ দুহাতে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল আশ্বিন।

পরাজিত সৈনিকের মতো থমকে যায়, আমন।

আশ্বিন কাপড়ে জড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। বলল, না আমন, আমি তোমাকে ঠকাতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করো।

আমন নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, কেন ? আশ্বিন, এ পথের খোঁজ তো আমার জানা ছিল না। তুমিই দেখিয়েছো পথ। কিন্তু এখন আবার কী হলো?

আমন, আমি বলতে পারবো না। সে ঘটনা বলা সম্ভব না।

আশ্বিন, তবুও তোমাকে বলতে হবে। নইলে আমি ভীষণ রাগ করবো।

আশ্বিন বাধ্য হল তার অতীত ঘটনা জানাতে। দরিদ্র কন্যা দায়গ্রস্থ পিতাকে উদ্ধার করতে ভিনদেশী এক যুবক ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে আশ্বিনকে বিয়ে করে নিজের বাড়িতে তোলার নামে এক নারী পাচারকারীর হাতে বিক্রি করে দেয়। সে পাষন্ড পাচারকারী বন্ধ ঘরে রেখে দিনের পর দিন বলাৎকার করেছে ভিন্ন পুরন্নষও এনেছে ঘরে। রাজী না হওয়ায় প্রচন্ড মারধোর করত। একবার ওরা নৌকা করে নিয়ে যাচ্ছিল বার্মা সীমান্তে্ম। কথা ছিল বার্মার দালালের হাতে বিক্রি করে দেবে এবং সে বার্মিজ দালাল থাইল্যান্ড নিয়ে যাবে।

নরপশুদের বলি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল সে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে। জ্ঞান ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করেছে আমনের ঘরের দূয়ারে।

তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। তারপর আর কথা বলার চেষ্টাও করেনি।

এতদিন পর সত্যিকার মানুষের ছোঁয়া পেয়ে আজ সে অন্যরকম নারী। কিন্তু আশ্বিন তার অপবিত্র নারীত্বে আমনের জীবনকে জড়াতে চায় না। কলুষিত করতে চায় না ওকে

সব কথা শুনে আামন জাপটে ধরে আশ্বিনকে। ফুল সব সময় পবিত্র। কোন কলুষিত ব্যক্তি ফুল স্পর্শ করলেই তাতে ফুলের পবিত্রতা স্লান হয় না। ওর কাছে আশ্বিনও তাই।

.....

লাভলী বাশার, বিশিষ্ট কবি ও গল্পকার, ঢাকা।

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

রহস্যটি আসলে কী?

"এমন বিষয় কি এখনো রয়েছে ভরে
ক্রিয়া যার দেখা যায় কর্তাবহু দূরে" ?

প্রাচীন গল্প কথা নয়, বানানো বা সাজা নো ও নয়, সত্যি ও টাটকা এক ঘটনার কথাই বলছি। শ্যালক কালাচানের বিয়ের ব্যাপারে কথা পাকাপাকি করার কাজে বাবু প্রমোদের সঙ্গে গিয়েছিলাম রাইং অ্যং এর সাগুইন পাড়ায়। পাত্রীর পিতা বাবু কুঞ্জধন তংচংঙ্গ্যার বাড়ী: বারান্দায় বসে আলাপ চলছে। বাবু কুঞ্জধণ, তাঁর স্ত্রী, মেজো ছেলে নরেন আর বাবু প্রমোদ ও আমি। বর কনের মন মানসিকতা, কনের দিক থেকে মাতা পিতা ও ভাইদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং বিয়ের ব্যাপারে সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপের পরে উপস্থিত সকলে প্রায় এক মতেই পৌছেছি এক পর্যায়ে। তখন বাকী থাকে শুধু অনুষ্ঠান গত দিকটা। অর্থ্যাৎ নির্দিষ্ট দিন, তারিখ ঠিক করা। কাজেই এনিয়ে ভারিক্কী তেমন আলাপ আর থাকেনা। কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী গেলেন ভিতরে মানে রান্না ঘরে। এতোক্ষন পারিবারিক যোগ বিয়োগের বা এক সম্পর্ক থেকে আরেক সম্পর্কের মাথা ঘামাতে গিয়ে সকলের মনে যেন একটু ভাব গম্ভীর ভাব বিরাজ করছে, তাই বুদ্ধি করে নরেন দা সম্পূর্ণ আলাদা এক প্রসঙ্গ তুললেন। বাবু প্রমোদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা প্রমোদ, তুমি আসলে কি ?

প্রমোদ বাবু পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যাপারের কথা ? নরেনদা পিতা কুঞ্জ বাবুর দিকে দেখিয়ে বললেন, বাবা-ইভঅল করে বলতে পারবেন। কুঞ্জ বাবু হঠাৎ বিষয়টি বুঝতে পারলেন না, তাই কেমন যেন আশ্চর্য্যের ভঙ্গীতে নরেনকে শুধালেন কী ? নরেনদা বললেন, ঐ যে সেদিনের হাতীর ঘটনার কথাই বলছি। আর তা শোনার সাথে সাথে কুঞ্জবাবু হো--হো করে হেসে উঠলেন, কাঁধে ঝুলানো গামছার এক মাথা টেনে মুখ মুছার পর বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই খুব মজার ব্যাপার! প্রমোদ বাবু আর আমি খুব মজার ব্যাপার! প্রমোদ বাবু আর আমি খুব অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে রইলাম। বিষয়টা যেন এক্ষুনিই পরিস্কার হতে চাই।

ইতিমধ্যে নরেনদার মা কিছু বিস্কুট, গুটিকয়েক কলা আর টাটকা গরম দুধে পূর্ণ চারটি গস্লাস নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসলেন, বললেন, "ও হাসিও পায় আর খুব রাগও লাগে।"

সংগে আনা ও সব আকর্ষণীয় দ্রব্যাদির বাসনটা টেবিলে রেখে পুনশ্চঃ বলা শুরম্ন করলেন, সেদিন আমরা এই ঘরের একজন নয়, দুজন নয় পাড়ার পুরো লোকেরাই যেন পাগল আর বোকা বনে গিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার, আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, শুনলে তোমরা হাসবে বিশ্বাস ও করবেনা। শুননা তোমাদের ভালই এর কাছ থেকে।

আমার মামা শ্বশুর আর প্রমোদবাবুর তালুই হেসে হেসে বলা শুরম্ন করলেন। আর আমরা প্রায় নাক-কান না নেড়ে শুনতে লাগলাম। একমাস আগের ঘটনা, অমাবস্যার রাত, রাত্রি প্রায় আট কি নয়টা হবে। তখন কচি ছেলেমেয়েরা ছাড়া পাড়ার প্রায় সকলেই জাগা ছিল। আমি রাতের খাবার পর হাত-মুখ ধুবার জন্য উঠানে বের হয়েছিলাম। তখন শুনলাম, ঐ যে পাহাড় চূড়ায় জঙ্গলের মধ্যে একটা বটগাছ। ঠিক ঐ জায়গাতেই পরাত করে এক শব্দ হলো। আর সাথে সাথে কানে ভেসে আসলো ঠিক যেন হাতী কলা গাছ চিড়ে খাচ্ছে-আর বড়ো বড়ো দু'টি কান নাড়ছে। ভাবলাম, আশেপাশে তো এমন পোষা হাতীও নেই আর হঠাৎ এই বুনো হাতী এতো কাছে কেমনে আসতে পারে? প্রথমে নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না । তাই পরিস্কার হবার জন্য খুব সন্তর্পনে এবং যথাদ্রম্নত আরও নিকটে মানে ঐ যে গোয়াল ঘর আছে ওখানে যেতে না যেতেই পূর্বের শব্দগুলো আরো স্পষ্ট এবং জোরালোই ঠেকলো। আর বিলম্বনা করে দৌড়ে ফিরে আসলাম। ঘরে এসে দেখলাম নাতি কনক ইতিমধ্যে দিয়েছে দৌড়। বুড়িকে (নরেনের মা) পেলাম কাঁধে তার ঝোলা আর হাতে ল্যাম্প নিয়ে দরজার সামনে। সেও পালানোর জন্য আমার অপেক্ষায় রয়েছে। খুব কষ্ট করে চুপিচুপি তাকে বললাম, চল চল ওপারে চল। ঘরের আশা ফেলে রাখ। জান বাচাঁও তাড়াতাড়ি। অমনি চট করে একটানে ২/৩টা কম্বল আর দা হাতে নিয়ে বেরম্নলাম।

নাতি কনক কোনদিকে গেল একদিকে তার জন্য চিন্তা আর সমূহ বিপদ ও ক্ষতির আশংকায় পথ চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর অনুভব হচ্ছিল যে, পাযেন আর চলেনা। হাটু যেন আর সহেনা। এতোক্ষন যেন রম্নদ্ধ ছিল শ্বাস। বুড়িকে নিয়ে যখন উত্তর পার্শ্বের ঐ খাড়া পাহাড়ের নীচে সামান্য একটু সমান জায়গা পেলাম, ভাবলাম, হাতীতো আর এখানে আসতে পারবেনা, তাই রাতটা এখানেই কাটানো যাবে। ওখানে বসে লম্বা লম্বা নি:শ্বাস ছেড়ে বুকটাকে যেন হালকা করতে চেষ্টা করছি; ঠিক তখনিই মাঝখানে বিরাট গভীর খাদের পরে সুউচ্চ পাহাড়ে হেডম্যানের বাড়ি থেকে ডাক শুনলাম ও কাকা, তোমরা কোথায় আছ, তোমাদের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বেই হাতী গাছ ভাঙছে; তাড়াতাতি সরে পড়ো: এপারে চরে এসো একথা শুনে ধরে নিলাম, হাতী একটা নয়- দুই দিকেই আসছে। ভাইপোকে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আসছি। তখন আর সহেনা, এখানে থাকাও নিরাপদ নয়, কি ভেজালেই না পড়লাম। বুড়িকে নিয়ে পশ্চিমদিকের পাহাড়ে ছেলে লীলাময়ের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

ইতিমধ্যে পাড়ার সবাই হাতীর শব্দ শোনে ডাকাডাকি আরম্ভ করেছে। বলাবলি করছে যে, আমাদের বাড়ির দিকেই হাতী এসেছে। ওপারে পৌছতেই স্বস্থির সাথে মনে মনে ভাবলাম হ্যাঁ বেচে গেছি। ছেলে লীলাময়ের বাড়ির সামনে পৌছতেই সে উঠানে দাড়ানো অবস্থায় আমাদের দেখে জিজ্ঞাস করে বাবা নাকি ? বললাম-হু। তারাও হাতী এসেছে বলে ডাকাডাকি শুনেছে

তবে হাতীর কোন আওয়াজ শুনেনি। লীলা আমায় জিজ্ঞেস করলো কোন জায়গার হাতীটা? কখন কোথায়? আমি হাফাতে হাফাতে যাচ্ছি ঠিক এ মূহূতেই চিড়িং করে আওয়াজ করলো লীলা আর আমাদের বাড়ির মাঝামাঝি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। ধরে নিলাম হাতীটা আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এরপর আর কোন শব্দ শোনা গেলনা। আমরাও হুক্কা আর সিগারেট টেনে টেনে কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর নিরাপদ মনে করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এ কথা বলার সাথে সাথেই কুঞ্জ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে ফেললেন। নরেনদা আর তার মাও এ হাসিতে যোগ দিলেন। তাতে প্রমোদ আর আমিও প্রশ্ন বোধক হাসি হাসলাম। প্রমোদ বাবু তাদের হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে নরেন দা বললেন, শুনোনা, বাবা বলছেন তো কুঞ্জ বাবু বলা শুরু করলেন, আসলে হাতী তাতী কিচ্ছুনা। প্রমোদ বাবু আবারও জিজ্ঞাস করলেন, তাই নাকি? কুঞ্জ বাবু বললেন, অনর্থক সেদিন এত কষ্ট করেছিলাম। যা হোক সবটাই বলি।

পরদিন সকাল হলো। কাছে বা দূরে কোথাও কোন হাতীর শব্দ শোনা গেলনা। লীলা আর আমি কয়েকটা কুকার সঙ্গে নিয়ে আমার এই ভিটার দিকে রওনা দিলাম। ওপার থেকে আরও দু'একজনকে ডাকলাম। এই পাহাড়ে আসতেই কুকুর গুলোকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলাম। আমরা ৪ জন কুকুর গুলোর পিছু পিছু খুব সতর্কভাবে আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম। ভিটার চারিপার্শ্বে এমনকি ঐ যে বটগাছের গোড়ায় যেখানে হাতীর গাছ ভাংগার শব্দ শুনে ছিলাম ওখান পর্যন্ত সব কিছু দেখলাম। কোথাও হাতীর চলাচলের চিহ্ন বা গাছ ভাঙ্গার চিহ্ন দেখতে পেলাম না। চারননেই তখন একেক জন আরেক জনের দিকে তাকাতে লাগলাম।

আমি (লেখক) তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম যেখানে যেখানে হাতীর শব্দ শোনা গেছে সব জায়গাই কি ভাল করে দেখেছেন? কুঞ্জবাবু বললেন, হ্যা, সব কিছুই দেখেছি; কোথাও হাতীর কোন চিহ্ন নেই।

প্রমোদ বাবু হেসে ঠাত্তা করে বললেন, তাহলে কোন দেবতাই আপনাদের কাছে বেড়াতে এসেছিল? আসলে কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে অবাস্তব কিছু বিশ্বাস করাতো দূরের কথা, তার সামনে এ ধরনের অলৌলিক কিছু -------- পর্যন্ত দু' চারটা কথা শুনিয়েই ছাড়তেন। নরেনদা বললেন, আমাদের কথায় বিশ্বাস না হলে পাড়ায় যে কারোর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিতে পারো। কুঞ্জ বাবুও বললেন, হ্যাঁ, আমরা নাহয় ভুল শুনেছিলাম, তবে পাড়ার প্রায় সব লোকই ভুল শুনবে কেন?

কুঞ্জ বাবু আমি বহুবার শুনেছি, লোকে বলতো, খকশা নামে একপ্রকার অপদেবতা নাকি আছে; বিশেষ বিশেষ স্থানে তারা অবস্থান করে আর মাঝে মধ্যে বিশেষত: অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় বিভিন্ন রকম শব্দের মাধ্যমে লোক জনকে ভয় লাগায় কিন্তু কখনো দেখা যায়না। আমি জীবনে কখনো খকশার সম্মূখীন হইনি। তেমন বিশ্বাস ও করতাম না। তবে একি হলো তাই? সত্যিই কী খকশা নামে কোন অপদেবতা দুনিয়াতে আছে? তোমরা কি মনে করো?

প্রমোদ বাবুর চোখে মুখে গম্ভীর ভাব, যেন গুরম্নতর কোন সমস্যার পড়েছেন। শেষে একটু হেসে বললেন, বিজ্ঞানতো ভুত বা অপদেবতা বলতে জীবন্ত মানুষের মস্তিস্কের ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার উপরই ছেড়ে দিতে চায়। তবে এক্ষেত্রে দেখা গেল যে, পাড়ার প্রায় সকলের মস্তিস্কতো একই সময়ে এভাবে একই রকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটবার কথা নয়? এজন্য বিষয়টা আমার কাছেও রহস্যই থেকে গেল।

.....

লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা , বিশিষ্ট লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক , রাজস্থলী , রাঙ্গামাটি।

রবিশ চাকমা

ব্যর্থ জীবন

মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম হওয়ার পর জুনানের জীবন শুরম্ন হয়, শিশু ,কিশোর ও যৌবনে পা দিতে কত জল্পনা কল্পনা, কত আশা আকাঙ্খা ও রঙিন স্বপ্ন । দাম্পত্য জীবন লাভ করে ছেলে সন্তান পাবে। ধর্মে কর্মে মহান হবে, এই আশার আলোকে সামানে রেখে বিয়ে করলেন এক কোমলমতি সুন্দরী নারী । তার চলমান দাম্পত্য জীবনে প্রথম সন্তান হলো। ছেলে হওয়াতে আরো কল্পনার সাগরে ভাসতে লাগলো। লেখা পড়া শিখবে বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করে তাদের দুঃখী জীবনের দুঃখ মোচন করবে। জুনানের মনে আরো কত কিছু তাই, আদর করে ছেলের নাম রাখলেন বিশ্বন্তর। বিশ্বন্তর শরীর ও বয়স বাড়তে লাগলে,হাটি হাটি, পা পা করে ৬ বছর যে দাড়ালো তখনি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলো, বিশ্বন্তর জীবনে শুরম্ন হলো শিক্ষা জীবন, তার অধ্যয়নের জীবনে কৃতিত্বের সাথে ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়। এই খুশিতে তার বাবা পড়া লেখার খরচ চালানোর জন্য বন জঙ্গলে লতা পাতা ও জঙ্গলী কলার ফল বিক্রি করে পড়া লেখার খরচ চালায়।

বিশ্বন্তর প্রাইমারি ও হাইস্কুল শেষ করে গ্রাম ছেড়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য শহরের চলে যায়।এমনি চলমানে একটানা ডিগ্রী পাস করে ম্যাজিস্ট্রেট চাকুরি নিয়ে এক সম্ভ্রাট পরিবার ও শহরের পরিবেশে তাল মিলতে গিয়ে ভুলে গেলে সেই মাতৃভূমি গ্রামের কথা ভুলে গেল আত্নীয় স্বজনের কথা এমন কি ভুললো মা-বাব দুঃখ কষ্টের কথা ও কোন দিন কোন সময় খবর নিল না আর সে গ্রামের মাতৃভূমির ভাল-মন্দ, অথচ গ্রামে থাকতে গ্রামের পরিবেশে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সাথে কাল বৈশাখী ঝড়ে দিনে ঝড়ে পড়া আম কুড়াতে।বর্ষা ঋতুতে বর্ষার বৃষ্টির পানিতে ছড়া ছড়ি দু-কুল পূর্ণ হলে কলাগাছের ভেলানিয়ে ভাসতো।

শরৎকালে কাশবনে ফুলের কাঠি তলে তিন খনা ঝুড়ি বানাতো। শীতের রাতে জ্যোৎসাহাসি মাখা আলোতে দাড়িয়ে বাঁধা,হা ডু-ডু খেলাখেলতো। বসন্ত কালে ঝড়া পাতার গাছের নিচে বৌ জামাই খেলাখেলে খুব মজা করতো। বিশ্বন্ত এখন শহরের পরিবেশে মিশে গিয়ে শহর ছাড়া অন্য কিছু ভাবতো না। এদিকে তার বাবাবেচারা কোন বিকল্পনা থাকতে তার সেই অতীতের মতো যেন জঙ্গলে লতা-পতা বিক্রি করে ঘর সংসারের খরচ মিটাতো। বুড়ো বাপটা বেচারা ঐ বনের লতাপাতা, কলাফুল নিয়ে শহরের বাজারে বেচা কেনা করতে গেল।বাজারে পৌছাঁলে সে লতা-পাতা কলাফুল সামনে রেখে অসহায় মনে মনে ভেবে আঁধমনা করে বসে

আছে,ঠিক তখন সময়ে বিশ্বন্তর স্মটি আশাক পোশাক পড়ে লাঠি হাতে করে ঐ শহরে বাজারে তরকারি কিনতে আসে। তার বাবার সামনে এসে কলা ফুলকে তার হাতের লাটি দিয়ে নাড়া দিতে বিশ্বন্তর বলে, ঐ বুড়ো এটা গাছে ধরে ? নাকি বাঁশে ধরে ? বেচারা বুড়ো ব্যটা মাথাটা উচু করে মুখটার দিকে ভাল করে চেয়ে, চিনে ফেলে তার ছেলে বলেছে,তখন বুড়ো দুঃখে অভিমানে তেলে আগুনে জুলে উঠে তখন তার মন। কলার ফুলটা দু-হাতে শক্ত করে ধরে ছেলেকে পিটানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্বন্তর টের পেয়ে পালাতে থাকে বুড়ো তার ছেলের পিছু পিছু যতক্ষণ শরীরের জোড় ছিল ততক্ষণ ছিলো, শেষে আর না পেরে ফিরে আসে। বিশ্বন্তর বাসায় পৌছালে সিদ্ধান্ত নিল এদেশে থাকলে মান সম্মান থাকবে না বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। তাই স্ব-পরিবারে বিদেশে চলে গেল, বিদেশে গিয়ে চাকরি ও পেলনা জমি-জমাও পেল না। সারা জীবন পরের গোলামী হয়ে থাকতে বাধ্য হলো।

.....

রবিশ চাকমা , উদীয়মান লেখক , রাঙ্গামাটি।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

গত ০৬ জানুয়ারী ২০১২ খ্রি: রাঙামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার চালু করা হয়। বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় এ পাঠাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ পাঠাগারে দুইটি দৈনিক পত্রিকা সহ হাজারখানেক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা আরো বই সংগ্রহ করছি। যে কোন ধরনের বই (নতুন বা পুরাতন) আমরা গ্রহণ করি। কেউ যদি আমাদের পাঠাগারে বই দিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নির্মল কান্তি চাকমা
মোবাইল: ০১৫৫৬৫৭৬৫৩৮
Email: bkkksrj@yahoo.com
পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক
বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

এ অহ্‌রিঙ ধাভাদেনা দিনত
যেন আহ্‌জি ন'যায়
বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
চিতদিঘোল কোচপানা
‖
জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা